মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা
মার্চ-২০২৪ ঈসায়ী
শাবান-রমাযান ১৪৪৫ হিজরী
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০ বাংলা

মসজিদ আল হাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

রেজি নং ডি.এ. ১৪২

৩য় পর্ব

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা

মার্চ ২০২৪ ঈসায়ী

শাবান-রমাযান ১৪৪৫ হিজরী

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩০ বাংলা

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী

সহযোগী সম্পাদক

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

প্রবাস সম্পাদক

শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন বিন আবদুর নূর

ব্যবস্থাপক

চৌধুরী মু'মিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক

মো : রমজান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম

মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)

আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন

প্রফেসর ডক্টর দেওয়ান আব্দুর রহীম

প্রফেসর ডক্টর মো. লোকমান হোসেন

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন

ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

শাইখ আবদুল্লা শাহেদ আল-মাদানী

শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী

শাইখ ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী

সম্পাদক
০১৭১৬-১০২৬৬৩
সহযোগী সম্পাদক
০১৭২০-১১৩১৮০
ব্যবস্থাপক :
০১৯১৬-৭০০৮৬৬

যোগাযোগ : মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৪৩৪ মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
ইমেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
www.ahlahadith.net.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

সার্কুলেশন বিভাগ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮
বিকাশ :
০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস

رেজি নং ডি.এ. ১৪২

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٦١٠٢٦٦٣

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي رحمه الله، المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق، رئيس التحرير: الأستاذ الدكتور أحمد الله تريشالي، مساعد التحرير: الشيخ مفضل حسين المدني.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড সহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৩০ ইউ.এস.ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০, ০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচীপত্র

দারসুল কুরআন

❖ মাহে রমাযান ও সিয়াম গুরুত্ব এবং ফযীলত।..................... ৩

শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী

দারসুল হাদীস

❖ সিয়াম গুনাহের কাফফারা।..৬

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা

সম্পাদকীয়

❖ অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস : আসন্ন রমাযানের আগাম শুভেচ্ছা।..........................৯

প্রবন্ধ :

❖ সিয়াম ও তাকওয়া : আত্মিক উন্নয়নের রূপরেখা।..............১০

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ

❖ মুক্তমনা বনাম সুস্থ ভাবনা।...২২

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব

❖ সিয়াম কিভাবে আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি এনে দেয়। ১৬

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের

❖ যাকাত সংক্রান্ত মাসায়িল।.......................................১৯

তাওহীদ বিন হেলাল

❖ নব্য জাহেলীয়াত।..২৩

সাইদুর রহমান

❖ নারীদের সিয়াম ও যুগের বাস্তবতা।.........................২৯

মাযহারুল ইসলাম

শুব্বান পাতা

❖ ভালোবাসার রমাযান : ফিরে এলা তাক্বওয়ার মাস।.........৩৪

আব্দুল্লাহ আল আসিফ

❖ দাওয়াত ও তাবলীগ।...৩৭

শাহাদাত হোসেন সামি

❖ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।..৪১

মুহা. মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার

❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।.......................................৪৪

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

মাহে রমাযান ও সিয়াম গুরুত্ব এবং ফযীলত

শাইখ মুফায্‌যল হুসাইন মাদানী❖

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ الۡقُرۡاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الۡهُدٰى وَالۡفُرۡقَانِ فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡكُمُ الشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ وَمَنۡ كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُوا الۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾

আয়াতের অনুবাদ : রমাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাস পেল, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে, আর যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পুরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পুরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং তোমরা যাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল সৃষ্টিকুলের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি কিছু সৃষ্টিকে বিশেষভাবে পছন্দ করে অন্য সৃষ্টির ওপরে সম্মানিত করেছেন। যেমন তিনি মানব জাতিকে সকল সৃষ্টির সেরা এবং সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন এবং তন্মধ্য থেকে বিশেষ কতককে নবী হিসেবে চয়ন করেছেন। তিনি গোটা পৃথিবীও সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে মসজিদের স্থানকে বিশেষভাবে পছন্দ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি মানুষের হিসাব রাখার জন্য ১২টি মাস নির্ণয় করে মাহে রমাযানকে বিশেষভাবে মর্যাদাবান করেছেন। তাইত আল্লাহ তাআলা বলেছেন : شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ الۡقُرۡاٰنُ-রমাযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ মাসটিকে বিশেষভাবে ফযীলতপূর্ণ করার কারণ এই যে, মাসটি হচ্ছে সিয়াম পালন করার মাস- যে মাসে বিশ্ববাসীর জন্য পথ-প্রদর্শক হিসেবে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত তাফসীর : আল্লাহ তাআলার বাণী : شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ الۡقُرۡاٰنُ - দ্বারা রমাযান মাসের সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা, এই পবিত্র মাসেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম নাযিল করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّآ أَنزَلۡنَاهُ فِي لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ - আমি কুরআনুল কারীমকে কদ্‌রের রজনীতে নাযিল করেছি।[২] আল্লাহ আরো বলেছেন: إِنَّآ أَنزَلۡنَاهُ فِي لَيۡلَةٍ مُّبَارَكَةٍ -আমি কুরআনকে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে।[৩] আর সহীহ হাদীস দ্বারা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ- বা কদরের রজনী এবং لَيۡلَةٍ مُّبَارَكَةٍ- তথা বরকতময় রাত, দুটো একই রাত এবং রাতটি রমাযান মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমনটি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা হতে বর্ণিত:

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

তিনি বলেছেন: রমাযান মাসের শেষের ১০ দিন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করে ই'তিকাফ করতেন। তিনি বলতেন: রমাযান মাসের শেষের ১০ দিন তোমরা কদরের রাতকে তালাশ কর।[৪]

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الۡهُدٰى وَالۡفُرۡقَانِ - দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমের মর্যাদা ও সম্মানের কথা ব্যক্ত করে বলেন: এটি বিশ্বমানবের জন্য পথ-প্রদর্শক এবং এতে রয়েছে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। বিবেকবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর মাধ্যমে সঠিক পথে পৌঁছে থাকে। এটা সত্য-মিথ্যা, হালাল-হারাম এবং ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী।[৫]

فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡكُمُ الشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُ- আয়াতের এই অংশ দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, রমাযানের চন্দ্র উদয়ের সময় যে ব্যক্তি বাড়ীতে

❖ সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও ভাইস প্রিন্সিপাল, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী-ঢাকা।

[১] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫

[২] সূরা আল-কদর, আয়াত : ১

[৩] সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৩

[৪] সহীহ বুখারী, হা : ২০২০, সহীহ মুসলিম, হা: ১১৬৯, তিরমিযী, হা : ৭৯২

[৫] আল-মিসবাহুল মুনীর ফি তাহযীব তাফসীর ইবনু কাসীর, পৃ : ১৩১

অবস্থান করবে, মুসাফির হবে না এবং সুস্থ ও সবল থাকবে, তাকে বাধ্যতামূলকভাবেই সিয়াম পালন করতে হবে। পূর্বে এদের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি ছিল; কিন্তু এখন আর অনুমতি রইল না। এটা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতির কথা বর্ণনা করে বলেন وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ-এরা এই সময় সিয়াম পালন করবে না এবং পরে আদায় করে নেবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তির শারীরিক কোনো সমস্যা রয়েছে যার ফলে তার পক্ষে সিয়াম পালন করা কষ্টকর হচ্ছে কিংবা সফরে রয়েছে, সে সিয়াম ছেড়ে দেবে এবং এভাবে যে কয়টি সিয়াম ছুটে যাবে তা পরে আদায় করে নেবে।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে যে, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-এরূপ অবস্থায় সিয়াম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই করুণা প্রদর্শন করেছেন এবং ইসলামের নির্দেশাবলী সহজ করে দিয়ে তাঁর বান্দাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করেছেন। হাদীসে এসেছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন: يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلاَ تُنَفِّرُوا- তোমরা সহজ কর, কঠিন কর না এবং সুসংবাদ দাও, বিরক্তিকর কিছু কর না।[৬] ইমাম বুখারীর (রহিমাহুল্লাহ) একটি হাদীসে রয়েছে, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-যে ব্যক্তি বিশ্বাস রেখে ও সওয়াবের নিয়তে রমাযানের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৭]

বর্ণিত, আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, রুগ্ন, মুসাফির প্রভৃতিকে অবকাশ দেয়া এবং তাদেরকে অপারগ মনে করার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা তাঁর বান্দাদের প্রতি সহজসাধ্য করা এবং তাদের পক্ষে যা দুঃসাধ্য, তার ইচ্ছা না করা। আর 'কাযার' নির্দেশ হচ্ছে গণনা পূর্ণ করার জন্য। সুতরাং তাঁর বান্দাদের উচিত তাঁর এই দয়া, নি'আমত এবং সুপথ প্রদর্শনের জন্য মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা।

আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে ইবাদত সম্পন্ন করা :

আল্লাহ তাআলা বলেন : وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ---তোমাদেরকে হিদায়াত দানের জন্য আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা কর। সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৫ এর অর্থ হল ইবাদত বা সালাত আদায়ের পর তোমরা তাঁকে স্মরণ কর। একই ধরনের বাণী রয়েছে নিম্নের আয়াতটিতে :

[৬] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৯*
[৭] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৮*

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾

অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের (হজ্জের) অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করে ফেল তখন যেরূপ তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে তদ্রুপ আল্লাহকে স্মরণ কর, বরং তদপেক্ষা দৃঢ়তরভাবে স্মরণ কর।[৮] অন্য জায়গায় তিনি জুমু'আর সালাত সম্বন্ধে বলেন :

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৯] অন্যত্র রয়েছে :

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾

তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাতের একাংশে এবং সালাতের পরেও।[১০] এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণীয় পন্থা এই যে, প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আল্লাহ তাআলার হামদ, তাসবীহ এবং তাকবীর পাঠ করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আছে,

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের সমাপ্তি তাঁর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির মাধ্যমেই জানতে পারতাম।[১১] এ আয়াতটি দলীল যে, ঈদুল ফিতরেও তাকবীর পাঠ করা উচিত।

অতঃপর বলা হচ্ছে যে, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালন করে তাঁর ফরযগুলো আদায় কর, তাঁর নিষিদ্ধ কাজগুলো হতে বিরত থেকে তাঁর সীমারেখার হিফাযত করতে পার তাহলে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারবে।

[৮] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২০০*
[৯] *সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত : ১০*
[১০] *সূরা কাফ, আয়াত : ৩৯-৪০*
[১১] *সহীহ বুখারী, হা : ৮৪২*

মাহে রমাযানের গুরুত্ব : এ মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

১. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে দানশীল ছিলেন আর রমাযান মাসে যখন জিব্রীল (আলাইহিস সালাম) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো অধিক দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) রমাযানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)–এর সঙ্গে যখন জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) দেখা করতেন, তখন তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো বাতাসের চেয়েও বেশি দানশীল হতেন।[১২]

২. এ মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين و مردة الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب و نادى مناد : يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر و لله عتقاء من النار.

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : যখন রমাযান মাসের প্রথম রাত হয়, শয়তান ও অবাধ্য জিনদেরকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এর একটিও খোলা রাখা হয় না। এদিকে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। একটিও বন্ধ রাখা হয় না। আহবানকারী (মালাক বা ফেরেশতা) ঘোষণা দেন, হে কল্যাণ অনুসন্ধানকারী! আল্লাহর কাজে এগিয়ে যাও। হে অকল্যাণ ও মন্দ অনুসন্ধানী! (অকল্যাণ কাজ হতে) থেমে যাও। এ মাসে আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করেন এবং এটা রমাযান (রমাযান মাসের) প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।[১৩]

[১২] *সহীহ বুখারী, হা : ৩২২০*
[১৩] *তিরমিযী, হা : ৬৮২*

৩. এ মাসে এমন একটি রজনী রয়েছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾

তোমাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী? 'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।[১৪]

৪. রমাযান মাসের ওমরাহ হজ্জের সমতুল্য। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : **عمرة في رمضان تعدل حجة**-[১৫]

অনুরূপভাবে সওম বা সিয়ামেরও ফযীলত রয়েছে অপরিসীম। যেমন রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের প্রত্যাশায় রমাযানের সিয়াম পালন করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[১৬] অন্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

আদম সন্তানের প্রতিটি আমল দশ গুণ থেকে সাতশত গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু সওম; সওম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব। কারণ সে আমারই জন্য তার কামাচার এবং পানাহার বর্জন করে। সওম (রোযা) পালনকারী ব্যক্তির জন্য খুশির বিষয় দুটি। একটি খুশি ইফতারের সময়, আরেকটি খুশি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। তার মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক উৎকৃষ্ট।

সুধী পাঠকবৃন্দ! আসুন আমরা যারা আল্লাহর মেহেরবানীতে রমাযান মাস পাব, তারা যেন এই পবিত্র মাসে সাওম পালন, ফরয সালাতসহ তারাবীর সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দান-খয়রাত এবং সকল প্রকারের ভালো কাজ বেশি করে সম্পাদন করি, আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

[১৪] *সূরা আল-কাদর, আয়াত : ২- ৩*
[১৫] *তিরমিযী, হা : ৯৩৯*
[১৬] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯০১*

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

সিয়াম গুনাহের কাফফারা

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা❖

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ قُلْتُ أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ ـ أَوْ عَلَيْهَا ـ لَجَرِيءٌ. قُلْتُ" فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْىُ". قَالَ لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ. قَالَ إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْنَا أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ.

হাদীসের অনুবাদ : হুযাইফাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা আমরা উমার ﵁-এর নিকট বসেছিলাম। তখন তিনি বললেন : ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য তোমাদের মধ্যে কে মনে রেখেছো? আমি বললাম : যেমনভাবে তিনি বলেছিলেন হুবহু তেমনই আমি মনে রেখেছি। উমার ﵁ বললেন : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর হাদীস মনে রাখার ব্যাপারে অবশ্যই তুমি দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছ। আমি বললাম : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন : মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, সালাত সিয়াম, সাদাকা, (ন্যায়ের) আদেশ নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। উমার ﵁ বললেন : এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সেই ফিতনার কথা বলছি যা সমুদ্রের ঢেউ এর ন্যায় ভয়াল হবে। হুযাইফাহ ﵁ বললেন : হে আমীরুল মুমিনীন! সে ব্যাপারে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা সে ফিতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার ﵁ জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজাটি কি ভেঙে ফেলা হবে নাকি খুলে দেওয়া হবে? হুযাইফাহ ﵁ বললেন : তা ভেঙে ফেলা হবে। উমার ﵁ বললেন : তাহলে তো আর কোনো দিন তা বন্ধ করা যাবে না। হুযাইফাহ ﵁-এর ছাত্র শাকীক (রহ.) বলেন : আমরা জিজ্ঞেস করলাম উমার ﵁ কি সে দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? হুযাইফাহ ﵁ বললেন : হ্যাঁ দিনের পূর্বে রাতের আগমন যেমন সুনিশ্চিত, তেমনি নিশ্চিতভাবে তিনি তা জানতেন।[১৭]

রাবী পরিচিতি : হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান হলো হুযাইফাহ ইবনু হুসাইল। তার বাবা হুসাইলকে ইয়ামান এজন্য বলা হয় যে, তিনি তার গোত্রের কোনো এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মদীনাতে পালিয়ে যান। সেখানে আব্দুল আশহাল গোত্রের সাথে সহযোগিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। আর আব্দুল আশহাল গোত্র ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। এ জন্য লোকেরা তার নাম দেন ইয়ামান। তার মাতার নাম রাবাব বিনতু কাব ইবনু আদী। তিনি এবং তার বাবা ইয়ামান উভয়েই উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার বাবা এ যুদ্ধে শহীদ হন। মুসলিম বাহিনী ভুলবশত তাকে হত্যা করে। তাকে মুসলিম বাহিনী শত্রু মনে করে তরবারী দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হলে হুযাইফাহ ﵁ বলতে থাকেন ইনি আমার বাবা। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর লোকেরা হুযাইফার ﵁ এ কথা শ্রবণ করার আগেই আঘাত করে বসে, ফলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটে। তখন হুযাইফাহ ﵁ বলেন : আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সকল দয়াশীলদের চাইতে অধিক দয়াবান, হুযাইফাহ ﵁ রাসূল ﷺ-এর গোপন বিষয়ে অবহিত বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটা এজন্য নয় যে রাসূল ﷺ তাকে আলাদাভাবে কিছু বলে দিয়েছেন। বরং তার স্বরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। ফলে রাসূল ﷺ যা বলতেন তিনি তা মনে রাখতে পারতেন যদিও অন্যরা তা ভুলে যেত। তিনি ﵁ বলেন, একদিন রাসূল ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ করলেন। ঐদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা সকলই তিনি উল্লেখ করলেন কোনো কিছু বাদ না দিয়ে। যে তা মুখস্থ রাখার সে তা মুখস্থ রেখেছে আর যে তা ভুলে যাওয়ার সে তা ভুলে গেছে। আর আমার সাথীগণও তা জানেন।[১৮]

সিলাহ ইবনু যুফার (রহ.) হতে বর্ণিত, আমরা হুযাইফাহ ﵁-কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি মুনাফিকদের সম্পর্কে এতো কী করে জানেন যা আবূ বকর ﵁ ও উমার ﵁-এর মতো

❖ মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১৭] সহীহ বুখারী, হা : ৫২৫

[১৮] সহীহ বুখারী, হা : ৬৬০৪, সহীহ মুসলিম, হা : ২৮৯১, আবূ দাউদ, হা : ৪২৪০

লোকেরা তা জানেন না। তিনি বললেন : একদা আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে ভ্রমণে ছিলাম। আমি রাসূল ﷺ-এর পিছে যাচ্ছিলাম। আর রাসূল ﷺ তার বাহনে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন আমি কিছু লোককে বলতে শুনলাম, আমরা যদি তাকে তার বাহন থেকে ফেলে দিতাম তাহলে তার ঘাড় মটকে যেত আর আমরা তার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতাম। আমি রাসূলের সাথেই তাদের মাঝে চলতে থাকলাম এবং উঁচু আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকলাম। এতে রাসূল ﷺ-এর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ওখানে কে? আমি বললাম : হুযাইফাহ। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন এরা কারা? আমি বললাম : অমুক, অমুক। আমি তাদের সকলের নাম বললাম। তিনি আবার বললেন : তারা যা বলেছে তা কি তুমি শুনেছ? আমি বললাম : হ্যাঁ। আর এজন্যই আমি আপনার ও তাদের মাঝে চলতেছি। তিনি বললেন : অমুক অমুক তাদের সকলের নাম উল্লেখ করে বললেন : এরা সবাই মুনাফিক। তবে তুমি কাউকে এ কথা বলো না।[১৯]

তিনি নবী ﷺ এবং উমার رضي الله عنه থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্যে অন্যতম : আল-আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ নাখাঈ, বিলাল ইবনু ইয়াহইয়া আল-আবসী, সা'লাবাহ ইবনু যাহদাম তামীমী, জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ, জুনদাব ইবনু আব্দুল্লাহ আল-বাজালী, হুসাইন ইবনু জুনদাব, খালিদ ইবনু খালিদ, যির ইবনু হুবাইশ, শাকীক ইবনু সালামাহ, সিলাহ ইবনু যুফার, তারেক ইবনু শিহাব ও আবূ উসমান নাহদী প্রমুখ।

তিনি আলী رضي الله عنه-এর খিলাফতকালের প্রথম দিকে ৩৬ হিজরী সালে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ .

মানুষ নিজের পরিবার পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়। এখানে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হওয়া যা তার জন্য বৈধ নয় অথবা তার ওপর যে কাজটা সম্পাদন করা ওয়াজিব ছিল তার ব্যত্যয় ঘটে। অতএব **فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো ব্যক্তির তার পরিবারের কারো প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়া, অথবা স্ত্রীদের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ না করে কাউকে বেশি দেওয়া আর কাউকে তার প্রাপ্যের চেয়ে কম দেওয়া এমনকি তাদের অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্য হতে কারো সন্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়া। অনুরূপভাবে স্ত্রীদের মধ্যে যার যে অধিকার তা আদায় করতে গাফলতি করা। মালের ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সম্পদ অর্জন ও তা রক্ষার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ইবাদত করতে না পারা অথবা মালের প্রতি মহব্বতের কারণে মালের মধ্য হতে আল্লাহর অধিকার (যাকাত) যথাযথভাবে আদায় না করা। সন্তানের ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বীয় সন্তানকে অন্যের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে অনান্যদের হক যথাযথ প্রদান না করা। যেমন স্বীয় সন্তানদের সম্পদশালী করার উদ্দেশ্যে পিতার সম্পদ থেকে বোনদের অংশ প্রদান না করা, অথবা ছেলেকে সম্পদশালী করার জন্য স্বীয় সম্পদ মেয়েকে প্রদান না করে শুধুমাত্র ছেলেকে প্রদান করা এসবই সন্তানের ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। পাড়া-প্রতিবেশীর ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাদের প্রতি হিংসা করা, তাদের প্রতি অহঙ্কার প্রদর্শন করা, তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া, তাদের সাথে দেওয়া ওয়াদা অঙ্গীকার পূরণ না করা ইত্যাদি। হাদীসে উল্লেখিত চার বস্তুর মধ্যে ফিতনা সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি উদাহরণ মাত্র। দুনিয়ার লেন-দেনের সকল ক্ষেত্রেই এ রকম ফিতনা রয়েছে। **تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْىُ** ওপরে বর্ণিত অপরাধের শাস্তি মোচন হয় সালাত সম্পাদন করা, সিয়াম পালন করা, সাদাকাহ তথা যাকাত প্রদান করা ও সৎ কাজের আদেশ প্রদান এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করার মাধ্যমে। অত্র হাদীসে বর্ণিত চার ধরনের সৎকাজই গুনাহ মোচনের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। বরং সকল প্রকার সৎ কাজের মাধ্যমেই গুনাহ মোচন হয়ে থাকে। তবে হাদীসে এ চার প্রকার কাজের উল্লেখ দ্বারা এ কাজগুলোর মর্যাদা অন্যান্য কাজের তুলনায় বেশি তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ চার প্রকার কাজের মধ্যে সিয়াম একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা দ্বারা গুনাহ মোচন হয়ে থাকে।

নবী ﷺ আরো বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ইমান তথা বিশ্বাসের সাথে সাওয়াবের আশায় রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২০] এখানে যে গুনাহ মোচন বা ক্ষমা

[১৯] *মু'জামুল কাবীর, ৩/১৮২-১৮৩ পৃ.*

[২০] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৮*

করার কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : সগীরা গুনাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾

যদি তোমরা কবীরা গুনাহ পরিহার কর যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে তাহলো তোমাদের সগীরা গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিব।[২১]

لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ.

এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি সেই ফিতনার কথা বলছি যা সমুদ্রের ঢেউ এর ন্যায় ভয়াল হবে। অর্থাৎ আমি সেই ফিতনার কথা বলছি যা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় একের পর এক আছড়িয়ে পড়তে থাকবে। অর্থাৎ মানুষের মাঝে কঠিন ঝগড়া-ফ্যাসাদ শুরু হবে যার ফলে মারামারি, কাটাকাটি হতে থাকবে।

إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا নিশ্চয় আপনার মাঝে এবং ঐ ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। অর্থাৎ আপনি যে ফিতনার কথা বলছেন সেই ফিতনা আপনার জীবদ্দশায় সংঘটিত হবে না। ফলে ঐ ফিতনাতে আপনার কোনো ক্ষতির আশংকা নেই। এখানে হুযায়ফাহ ﷺ প্রকৃত বিষয় আড়াল করে রেখেছেন এজন্য যে, তিনি গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাননি। হয়ত তিনি এ কথাও জানতেন যে, উমার ﷺ নিহত হবেন কিন্তু উমার ﷺ-কে সরাসরি এ বিষয়ে কথা বলতে অপছন্দ করেছেন তাই ইশারা ইঙ্গিতে মূল বিষয় জানিয়ে দিয়েছেন প্রকৃত বিষয় আড়াল করে। কেননা উমার ﷺ জানতেন যে, তিনিই সে দরজা। قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ দরজাটি কি খোলা হবে নাকি ভাঙা হবে? খোলা হবে দ্বারা মৃত্যু বরণের ইঙ্গিত আর ভাঙা হবে দ্বারা হত্যার ইঙ্গিতও হতে পারে। হুযাইফাহ ﷺ যখন উমার ﷺ প্রশ্নের জবাবে বললেন يُكْسَرُ ভাঙা হবে তখন উমার ﷺ বললেন : إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا তাহলে তো তা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। কেননা দরজা বন্ধ করার জন্য তা সঠিক অবস্থায় থাকা জরুরি যেহেতু দরজা ভেঙে ফেলা হবে তা সঠিক অবস্থায় থাকবে না। অতএব তা আর বন্ধ করার সুযোগ হবে না। আর উমার ﷺ এ কথা বলেছিলেন তার নিকট যেসব প্রমাণাদী ছিল যে, এই উম্মাতের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি হবে এবং তা কিয়ামত অবধি চলতে থাকবে তার ভিত্তিতে তিনি বললেন যে তাহলে তা আর বন্ধ করা যাবে না।

قَالَ نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ হুযাইফাহ ﷺ বললেন: হ্যাঁ তিনি দরজা সম্পর্কে ঠিক এমনভাবে জানতেন যেমন দিনের আগে রাত থাকে আর রাতের পরে দিনের আগমন যেভাবে সুনিশ্চিত তেমনি সুনিশ্চিতভাবেই জানতেন যে, তিনিই সে দরজা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যদি জেনেই থাকবেন সে দরজা তিনিই, তাহলে তিনি তো এটাও জানবেন যে, তা খোলা হবে নাকি ভাঙা হবে? তবে তিনি কেন প্রশ্ন করলেন? এর জবাবে এটা বলা যেতে পারে যে, কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে এমনটিই ঘটে অর্থাৎ জানা বিষয়েও সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যাতে কেউ তাকে তা স্মরণ করিয়ে দেন।

হাদীসের শিক্ষা :

(১) সৎ কাজ সগীরা গুনাহের মোচনকারী।

(২) হাদীসে বর্ণিত চারটি সৎকাজ অন্যান্য সৎ কাজের চেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন।

(৩) যেহেতু সিয়াম নফসকে বেশি সংযমী করে তাই অধিকহারে সিয়াম পালন করা উচিত।

(৪) স্বীয় পরিবার, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এ সকল বিষয় যদিও কল্যাণকর হবে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে উহা ক্ষতির কারণে পরিণত হয়।

(৫) সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ যে সমাজে যত বেশি থাকবে সে সমাজে ততবেশি শান্তি বিরাজ করবে। আর যে সমাজ থেকে তা উঠে যাবে সেখানেই ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে।

(৬) কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো দুঃসংবাদ তাকে সরাসরি না বলে ইশারা ইঙ্গিতে অবহিত করা ভাল।

(৭) কোনো বিষয় ভুলে গেলে তা জেনে নেওয়া উচিত।

(৮) কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তি তার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হতে জেনে নেওয়া কোনো দোষের বিষয় নয়। বরং তা মানুষকে বিনয়ী করে তোলে।

(৯) অহংকার মানুষকে প্রকৃত জ্ঞান থেকে দূরে রাখে।

(১০) মানুষ যত বিনয়ী হয় সে তত বেশি মর্যাদাবান হয়।□

[২১] *সূরা আন-নিসা, আয়াত :* ৩১

সম্পাদকীয় : الافتتاحية

অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস : আসন্ন রমাযানের আগাম শুভেচ্ছা

আল-হামদু লিল্লাহ। অত্যন্ত সফলভাবে শেষ হলো বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় দাওয়াহ ও তাবলীগী ঐতিহাসিক ইসলামী মহাসম্মেলন, ২০২৪। ঢাকার অদূরে আশুলিয়া থানাধীন বাইপাইলস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সংলগ্ন, আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরাইশী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) মডেল মাদরাসা ও জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা মাদরাসা ময়দানে (প্রস্তাবিত; আল্লামা প্রফেসর ড. এম এ বারী জমঈয়ত ময়দান) অনুষ্ঠিত হলো এ মহাসম্মেলন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। অতিথি ছিলেন ঢাকা-৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক সফল নির্বাচিত মেয়র আলহাজ মোহাম্মদ সাঈদ খোকন। আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা-১৯ আসনের মাননীয় এমপি জনাব সাইফুল ইসলাম, উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই-এর সাবেক সভাপতি, বাইপাইলস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী সাইন্স এন্ড টেকনোলোজি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান ও জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত অন্যতম উপদেষ্টা জনাব আলহাজ কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ। আরো উপস্থিত ছিলেন, মাসকো গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও জমঈয়তের অন্যতম উপদেষ্টা জনাব আলহাজ এম এ সবুরসহ অনেক গুণীজন। বিদেশী মেহমানদের মধ্যে আল্লামা আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জামাতা, বিশিষ্ট সাউদী দাঈ শাইখ মাহির বিন যফির আল-কাহতানী, জর্ডানের শাইখ ড. উসামা আতায়া আল-উতাইবী, নেপালের শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মদ হানিফ মাদানী, মিশরের শাইখ ড. তলা'আত আব্দুর রাযিক মাহমুদ যাহরানসহ অনেক বিশ্ববরেণ্য মেহমান। এবারের এ মহাসম্মেলনের মাধ্যমে অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সাউদী আরব, মিশর, জর্ডান, নেপাল ও বিভিন্ন দেশের মেহমানদের অংশগ্রহণে সম্মেলন হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন। উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল সাউদী মাননীয় রাষ্ট্রদূতের সম্মেলনে অংশগ্রহণ। হারামাইনের সম্মানিত ইমামদের অংশ গ্রহণের জন্য জমঈয়তের আবেদনের প্রেক্ষিতে সাউদী ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সাউদী রাষ্টদূতের অংশগ্রহণ সম্মেলনের গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আবারও প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের আহলে হাদীসদের সর্ববৃহৎ দাওয়াতী কাফেলা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস, হাদীস বিজ্ঞানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গবেষক, রিজাল শাস্ত্রবিদ ও বিশেষজ্ঞ গবেষক আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর জামাতার জুমু'আর নামাযে ইমামতিতে লাখো লোকের অংশগ্রহণ এক অনন্য দৃষ্টান্ত ও নযীর স্থাপিত হয়। আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিদের বক্তব্যে সমগ্র দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী লাখো মুসল্লি ও জমঈয়তকর্মীগণ অনুপ্রাণীত হন। তাওহীদের ওপর আলোচনাগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাণবন্ত। শিরক-বিদ'আত থেকে বেঁচে চলার আহবান ছিল সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দাওয়াত। এ বিষয়েই বিদেশী মেহমানগণ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন। এমন একটি সফল সম্মেলনের জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আবারও বছর ঘুরে আমাদের দ্বারে রমাযান কারীম এসে হাযির। ক'দিনের মধ্যেই আকাশের দরজাসমূহ খুলে যাবে, খুলে যাবে জান্নাতের দরজাগুলোও। বন্ধ হবে জাহান্নামের দরজাসমূহ। অবারিত হবে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত, বরকত ও মাগফিরাত। দিনে সিয়াম, রাতে কিয়ামের মাধ্যমে বান্দা অর্জন করবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। রমাযানের এ শুভ আগমনে মাসিক তর্জুমানুল হাদীসের পাঠকদেরকে জানাই আগাম অভিনন্দন। সিয়াম, কিয়াম, সাহারী, ইফতার ও দান সাদাকার মাধ্যমে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে আমরা তৎপর হবো এটিই হোক আমাদের প্রত্যয়। রমাযান হোক আমাদের সকলের জন্য জান্নাত লাভের উপায়। মোবারক হোক মাহে রমাযান। আমীন। ❐❑

সিয়াম ও তাকওয়া : আত্মিক উন্নয়নের রূপরেখা

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ*

মানুষের সৎগুণাবলীর মধ্যে তাকওয়া এমন একটি গুণ যা সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে প্রফেশনালিজম তৈরি করে। তাকওয়ার গুণের ফলে মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। এ গুণ মানুষকে সৎ হিসেবে চলতে মানসিক শক্তি দেয় এবং ব্যক্তিকে সৎ বানায়। যার ফলে পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। তাকওয়ার অভাবে ভোগবাদী ও বস্তুবাদী মানসিকতার জন্ম হয়; ফলে মানব চরিত্র পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। যার নজির বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র বিরাজমান। সমস্যাসংকুল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে যতদিন না তাকওয়া সৃষ্টি হবে, ততদিন মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও মঙ্গল আশা করা যায় না। তাই বলা যায়, তাকওয়া হলো, মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত জীবনের মুক্তি ও নাজাতের মূল চাবিকাঠি। তাকওয়ার এ অনবদ্য গুণ অর্জনে সিয়ামের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি যথাযথ আদব রক্ষা করে সিয়াম পালন করলে এ তাকওয়ার গুণ অর্জিত হতে পারে। তাকওয়ার গুণ অর্জনের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো- সিয়াম পালন। কারণ এ ইবাদত শুধু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পালন করা হয়।

তাকওয়া আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরহেজ করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় তাকওয়া হলো, একমাত্র আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়া থাকে তাকে মুত্তাকি বলা হয়। সৎ গুণাবলির মধ্যে তাকওয়া হচ্ছে অন্যতম। যার মধ্যে তাকওয়া থাকে সে পার্থিব জীবনের লোভে কোনো খারাপ কাজ করে না এবং পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও মঙ্গলের কাজে সব সময় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবিরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম-কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকি বলা হয়। পক্ষান্তরে সিয়াম হলো আল্লাহর নির্ধারিত নির্দেশনার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে পানাহার ও যৌনাচার থেকে নিজেদের বিরত থাকা। শুধু এ তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকাই নয়; বরং এ সময় অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হয়। সুনির্দিষ্ট আদবসহ সিয়াম পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মিক উন্নতি লাভের ফলে তাকওয়ার গুণ লাভ হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। কেননা, সিয়াম পালনরত ব্যক্তি মিথ্যা কথা, মিথ্যা অভ্যাস ও মূর্খতা ছাড়তে না পারলে তার পানাহার ত্যাগ করা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই মর্মে হাদীসে এসেছে।[২২] তাকওয়ার আবেদনের মতো সিয়ামের চেতনাও মানুষকে পরিশুদ্ধ করতে, আত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে ও আলোকিত মানুষে পরিণত করতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় যে, সিয়ামের সাথে তাকওয়ার সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

তাকওয়া মানুষের চরিত্রের অন্যতম প্রত্যাশিত ও লোভনীয় সম্পদ। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূলভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের চালিকাশক্তি হচ্ছে তাকওয়া। কারণ, কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে প্রকৃত পক্ষে ভয় পেলে সে দুনিয়াবী যাবতীয় অনাচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। তার জীবন স্বাভাবিক ও সাধারণ অন্য লোকদের মতো হবে না। যেমনিভাবে সত্যিকারের রোযাদার আর সাধারণ রোযাদারের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ রোযাদার সিয়াম পালনরত অবস্থায় ইসলামের যাবতীয় নিষেধাবলি থেকে দূরে থাকা বা পরিহার করার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকে না বরং রোযা রেখেই ঘুষ খাবে, ওজনে কম দেবে বা অন্যান্য অনাচারে লিপ্ত হবে। আর আদবসহ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি সিয়ামপালনরত অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যের জন্য ইবাদত-বন্দেগী আরো বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলামের নিষেধাবলিসমূহ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে।

*সহকারী অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)
সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

[২২] সহীহ বুখারী, হা : ১৮০৪

রোযাদার ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে, নিজের আত্মিক উন্নয়ন ঘটাতে এ পবিত্রতম সময়ে আরো বেশি মনোযোগী হন। সত্যিকারভাবে আল্লাহর কাছে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য খুলুসিয়্যাতের মতো নির্ভেজাল চেতনা থাকা আবশ্যক। তাকওয়ার অধিকারী ব্যক্তি এ চেতনায় অগ্রগামী হন। সিয়াম এ চেতনা তৈরিতে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর।'[২৩] আরো বলা হয়েছে- 'এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর মনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন।'[২৪] তাকওয়া আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভ করার উপায়। কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।'[২৫] আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে এরশাদ করেন- 'মুত্তাকিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে।'[২৬] মুত্তাকিরা আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।'[২৭]

তাকওয়া শুধু মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় না, বরং তা জান্নাতে প্রবেশ করতেও সাহায্য করে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।'[২৮] পক্ষান্তরে সাওম পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির যাবতীয় গুনাহ বা অপরাধ থেকে পবিত্র হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়, যদি কেউ সেই সুযোগ কাজে লাগাতে চায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কেউ ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে সিয়াম পালন করে, তার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[২৯] এ হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় আরো বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ 'কিয়ামুল্লাইল করে' অন্য জায়গায় এসেছে 'ক্বাদর রাতে কিয়ামুল্লাইল করে' তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পাপমুক্ত হওয়ার ভেতর দিয়ে ব্যক্তি মুত্তাকী হন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় পাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয়। আর এসব লোকের লাইফস্টাইল অন্যদের চেয়ে ভিন্নতর হতে থাকে। এ সৎ গুণের প্রভাব পড়তে থাকে ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার ও সভ্যতার দেয়ালে।

তাকওয়া প্রসঙ্গে রাসূল ﷺ থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত সাহাবি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে অধিক সম্মানিত কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে অধিক মুত্তাকি বা পরহেজগার।[৩০] অন্যদিকে হাদীসে পাপ থেকে বেঁচে থাকার ঢাল হিসেবে সাওমকে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঢাল যেভাবে সেইভ করে ব্যক্তিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে, সাওমের চেতনাও মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে রাখে। ফলে সে আল্লাহর মুত্তাকী বান্দায় পরিণত হতে শুরু করে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা এসব গুণ দান করুন। (মুসলিম) আদী ইবনে হাতিম তাই রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে শপথ করে, অতঃপর সে অন্য কিছু এর চেয়ে বেশি তাকওয়াপূর্ণ মনে করে, তবে সে যেন তাকওয়াপূর্ণ বিষয়কেই অবলম্বন করে।[৩১]

মহানবী ﷺ-এর প্রখ্যাত সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু যিনি ইলমে কুরআন বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন (এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে যার বিশেষ মর্যাদার কথা প্রত্যয়ন করেছেন)। একদিন আমীরুল মুমিনীন ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকওয়া (তথা পরহেজগারিতা)-এর তাৎপর্য কী? হযরত উবাই রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'কখনও কণ্টাকাকীর্ণ পথ চলার সুযোগ তো অবশ্যই আপনার হয়ে থাকবে।' ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'বিলক্ষণ; বহুবার এমন পথ চলার

[২৩] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০২*
[২৪] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৯৪, সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১২৩*
[২৫] *সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ৪,৭; সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৭৬*
[২৬] *সূরা আদ-দুখান, আয়াত : ৫১*
[২৭] *সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩*
[২৮] *সূরা নাযি'আত, আয়াত : ৪০-৪১*
[২৯] *সহীহ বুখারী*
[৩০] *সহীহ বুখারী, ও সহীহ মুসলিম*
[৩১] *সহীহ মুসলিম*

সুযোগ হয়েছে।' উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'তখন আপনি কী করেছেন?' ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'আমি আমার দেহ ও পরিধেয় কাপড়-চোপড়কে কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে অক্ষত বেরিয়ে যেতে পারি।' উবাই (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, 'ফাযালিকাত তাকওয়া'। (এটিই হলো তাকওয়ার তাৎপর্য)।[৩২] আসলে তাকওয়ার চাইতে সালঙ্কার ও উত্তম ব্যাখ্যা আর কিছুই হতে পারে না।

কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে তাকওয়া বা পরহেজগারিতা অবলম্বনের উপদেশ ও তাকিদ করা হয়েছে, সেসব গণনা করাও কঠিন। ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো যেমনটি তাকে ভয় করা উচিত। আর (শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এ তাকওয়ার ওপর স্থির থেকে মনেপ্রাণে নিজের সে মালিকের আনুগত্য করতে থাক, এমনকি) সেই আনুগত্যের অবস্থায়ই যেন তোমার মৃত্যু আসে।'[৩৩] অর্থাৎ, যে আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা এবং যার হাতে জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা। যিনি অপরিসীম করুণা ও রহমতের অধিকারী এবং যার পরাক্রম ও রোষেরও কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এমনই মালিককে বান্দার যেভাবে ভয় করা কর্তব্য, ঈমানদাররা তাকে সেভাবেই ভয় করে থাকবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার আনুগত্য করতে থাকবে।

সূরা তাগাবুনে এ বিষয়টিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- 'আল্লাহকে ভয় কর এবং তাকওয়া (পরহেজগারিতা) অবলম্বন করো যতটা তোমাদের দ্বারা সম্ভব। আর মনেপ্রাণে তার যাবতীয় নির্দেশ শোনো ও পালন করো।'[৩৪] সূরা হাশরে বলা হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো। বস্তুত প্রত্যেক নিঃশ্বাস গ্রহণকারীর অবশ্যই লক্ষ্য করা (এবং ভাবা) উচিত যে, কালকের জন্য অর্থাৎ আখেরাতের জন্য) সে কী প্রেরণ করল (পাথেয় ব্যবস্থা করল)। আর (তোমাদের বারংবার তাকিদ করা হচ্ছে যে,) আল্লাহকে ভয় করতে থাক। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় ভূত-ভবিষ্যৎ কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত (তোমাদের কোনো কর্ম তার কাছে গোপন নেই)।[৩৫]

আল-কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, আল্লাহ, আখেরাত দিবস (পরকাল) ও নবুয়্যাত পরম্পরার প্রতি ঈমান আনার পর যেসব বিষয়ের দাওয়াত কুরআন মাজীদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দিয়েছে এবং সেগুলোকে বলতে গেলে মানুষের কল্যাণ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হিসেবে বর্ণনা করেছে। তন্মধ্যে একটি হলো তাকওয়া বা পরহেজগারিতা। তাকওয়ার আসল তাৎপর্য হলো এই যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলা ও আখেরাত দিবসের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসসহকারে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষ, তার পাকড়াও, আখেরাতের আযাব ও হিসাব-কিতাবের ভয়ে সতর্ক-সংহত জীবনযাপন করবে। অন্যদিকে সিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষের লাগামহীন জীবন-যাপনের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি নির্দিষ্ট ছকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহর বিধানের আওতায় দিনাতিপাত করতে হয়। ফলে সর্বদা সিয়ামের আদব পালনের জন্য সতর্ক থাকতে হয়। পরকালের শাস্তির ভয় এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির তীব্র নেশায় ঈমানদারগণ পাগলপারা থাকেন এ সময়ে। তাকওয়ার শক্তি যেমনিভাবে ব্যক্তিকে সোনার মানুষ হতে উপজীব্য ভূমিকা পালন করে; ঠিক তেমনিভাবে সিয়াম আদায়ও মানুষকে আলোকিত মানুষ বানায়। পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও আলোকিত মানুষে পরিণত করে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সিয়াম পালনের মাধ্যমে মুত্তাকী হয়ে জীবন-যাপনের সুযোগ দিন। আমাদের কবুল করুন। আমীন। ❑❑

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করালো তার জন্য উক্ত রোজাদারের সমোপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে, সাওয়াবের কমতি হবে না। (তিরমিযী হা : ৮০৭)

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে লোকে যতোদিন, অবিলম্বে ইফতার করবে ততোদিন কল্যাণে থাকবে। (সহীহ বুখারী হা : ১৮২১)

[৩২] *ইবনে কাসীর : ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০*
[৩৩] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০২*
[৩৪] *সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত : ১৬*
[৩৫] *সূরা হাশর, আয়াত : ১৮*

মুক্তমনা বনাম সুস্থ ভাবনা

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব *

(পর্ব-৫)

❁ **কমিউনিজম ও নাস্তিক্যবাদ :** কমিউনিজমের সাথে নাস্তিক্যবাদ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ কমিউনিজমের জন্মই হয়েছে নাস্তিক্যবাদের মধ্য দিয়ে; কমিউনিজমকে আধুনিক নাস্তিকতার রূপকার বললে মোটেও তা অতিরিক্ত হবে না। কমিউনিজম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেমন ৪৮৭ সালে পারস্যে তথা বর্তমানের ইরানে এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে যার নাম ছিলো মাযদাক, সে পুঁজিবাদ বিরোধী ও নারী অধিকারের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে থাকে। যেটা বর্তমান কমিউনিষ্টদেরও মূলনীতি। এর পরবর্তীতে পারস্যে ২৮৮ হিজরতে আরো এক ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে যার নাম ছিলো হামাদান কারামত। সেও অনুরূপ মতবাদ প্রচার করতো। তার প্রচারকৃত মতবাদটি কারামতাহ নামে পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করে। আর মাযদাকের প্রচারকৃত মতবাদ পরবর্তীতে মাযদাকি মতবাদ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৩৬]

মাযদাকি মতবাদ ও কারামতাহ মতবাদ এবং বর্তমানের কমিউনিজমের আদর্শ ও চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমানের আধুনিক কমিউনিজকে মার্কসবাদীও বলা হয়। আধুনিক কমিউনিজমের জনক কার্ল মার্কসের পুরো নাম হলো কার্ল হাইনরিশ মার্কস। তিনি ১৮১৮ সালের ৫ই মে জার্মানের এক ইহুদী পরিবারে জন্মলাভ করেন। ১৪ই মার্চ ১৮৮৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং কার্ল মার্কস একজন জার্মান ইহুদী নাস্তিক দার্শনিক ছিলেন। কমিউনিজম মতবাদ প্রতিষ্ঠায় তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (২৮ নভেম্বর ১৮২০ খৃ.-৫ই আগস্ট ১৮৯৫ খৃ.) তিনিও একজন জার্মান ইহুদী ছিলেন। ১৮৪৮ সালে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস যৌথভাবে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার রচনা করেন। সেখান থেকেই আধুনিক কমিউনিজমের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মার্কসবাদী কমিউনিজম রাশিয়াতে ১৯১৬ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ ইলিয়ানও ওরফে লেনিন (২২ এপ্রিল ১৮৭০ খৃ.- ২১ জানুয়ারী ১৯২৪ খৃ.) এর হাত ধরে লেনিনবাদ কমিউনিজমের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং চীনে ১৯২১ সালের ১লা জুলাইয়ে মাওসেতুং (২৬ ডিসেম্বর ১৮৯ খৃ. -৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ খৃ.) এর হাত ধরে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

❁ **নাস্তিকতাই কমিউনিজমের মূলভিত্তি :** আধুনিক কমিউনিজমের মূল লক্ষ্য নাস্তিকতার বিস্তার ঘটানো এবং ধর্মের প্রভাবমুক্ত অবিশ্বাসের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। কার্ল মার্কসের কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যই ছিলো মানুষকে ধর্মহীন নাস্তিকতায় রূপান্তরিত করা ও স্রষ্টাহীন সৃষ্টির বিশ্বাসকে শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত করা।

কমিউনিজম যে আল্লাহ ও ধর্মবিরোধ এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। কমিউনিজমের মধ্যে যতোই স্থান কাল ভেদে মতভিন্নতা থাকুক না কেন হোক সেটা মার্কসবাদ, লেলিনবাদ, এঙ্গেলবাদ ডারউইনবাদ কিংবা মাওসেতুংবাদ; এদের সকলেরই লক্ষ্য - উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

অর্থাৎ, ধর্মবিদ্বেষ ও নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসার তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (মার্কসের সঙ্গে যৌথভাবে ১৮৪৮ সালে কমিনিস্ট পার্টির ইশতেহার রচনা করে) বলেছেন : আজ পর্যন্ত সকল ধর্ম বিশেষ বিশেষ জাতির কিংবা বিশেষ বিশেষ জাতিসমষ্টির বিকাশের ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কমিউনিজম হলো ঐতিহাসিক বিকাশের সেই স্তর, যা বর্তমান সকল ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয় এবং তাদের অবসান ঘটায়।[৩৭]

এখানে এঙ্গেলসের বক্তব্যে ধর্ম সম্পর্কে দুটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা হলো : (১) কমিউনিজম এমন একটি চেতনা যা সকল ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় করে।

(২) কমিউনিজম সকল ধর্মের অবসান ঘটাতে চায় বা সকল ধর্মকে বাতিল করতে চায়।

মার্কস ঠিকই ধর্মকে মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় করতে যেয়ে সে নিজে এবং তার নিজস্ব মতবাদ কমিউনিজমকেই মানুষের কাছে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। শুধু কার্ল মার্কসই নয় তার পূর্ববর্তী যারাই ধর্মকে অপ্রয়োজনীয় করতে চেয়েছে তারাই জাতির কাছে অপ্রয়োজনীয় ও চরমভাবে তামাশার পাত্র হয়েছে। কারণ পৃথিবীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎতকালে এমন পাপীর সন্ধান পাওয়া যাবে না যে ধর্ম থেকে মুক্ত কিংবা ধর্ম তার কাছে প্রয়োজনহীন বিষয়।

---

* মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৩৬] *আল মু'জায ফি আল আদইয়ানি ওয়াল মাযাহিব- ৯৭ পৃ.*

[৩৭] *কমিউনিজমের মূলনীতি : ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা.*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾

তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার কাছে আত্মসমর্পণ করানো হবে।[৩৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহর প্রতি সিজদায় নত হয় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সিজদায় নত হয়।[৩৯]

দুটো আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়ার সমস্ত কিছুই এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে কিংবা সিজদায় নত হয়, এর অর্থ হলো দুনিয়ার সমস্ত কিছুই ধর্ম পালন করে। সুতরাং ধর্ম সবার কাছে অতীব প্রয়োজনীয় একটি বিষয় যা কোনো ক্রমেই অপ্রয়োজনীয় করা সম্ভব নয়।

এমনকি কার্ল মার্কস স্বয়ং ধর্মের প্রতি আনুগত্যশীল সেটা অবশ্যই স্বেচ্ছায় নয় বরং সেটা তার ইচ্ছা ও জ্ঞান দুটোরই বহির্ভূত বিষয়। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন তো!! মার্কসের দর্শন যদি ধর্মকে অপ্রয়োজনীয়ই করে দেয় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কথা وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ তাদের ছায়াগুলোও আল্লাহর প্রতি সকাল-সন্ধ্যা সিজদায় নত হয়। এর অর্থ হলো সমস্ত কিছুর ছায়া আল্লাহকে সিজদা করে। অর্থাৎ ধর্ম মেনে চলে। মার্কস ও তার অনুসারীরা নিজেদের ছায়াগুলোকে কি স্বাভাবিক চলনের বিপরীত দিকে পরিচালিত করতে পারবেন???

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ প্রত্যেক আত্মাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে।[৪০]

অর্থাৎ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাটা ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, কারণ এটা ধর্মের নির্দেশ। তাহলে মার্কস ও মার্কসবাদীরা কি মৃত্যুবরণ ব্যতীত জীবিত রয়েছে বা থাকবে? মোটেও নয়।

এর অর্থ দাঁড়ায়, মার্কস নিজেও কখনই ধর্মের বাধ্যবাধকতার বাহিরে যেতে পারেননি। সুতরাং ধর্ম অপ্রয়োজনীয় নয় বরং প্রত্যেকের জন্য ধর্ম আবশ্যকীয় ও অপরিহার্য বিষয়। মূলত মার্কসের চিন্তাধারাই ছিলো অপ্রয়োজনীয়, অহেতুক ও মুর্খতায় ভরপুর।

ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের আরো একটি বক্তব্য হলো : ধর্ম হলো নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন জগতের হৃদয়, ঠিক যেমন সেটা হলো আত্মাবিহীন পরিবেশের আত্মা ধর্ম হলো জনগণের জন্য আফিম।[৪১]

আমরা ইতঃপূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আফিম নয় বরং অবিশ্বাসই আফিম।

মার্কসের সহযোগী এঙ্গেলসের ভাষায় : ধর্ম, দর্শন, ইত্যাদি আরো উদ্ধাচারি ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রেগুলির প্রসংগে বলা চলে, এদের একটা প্রাগৈতিহাসিক অন্তাবস্তু রয়েছে। আজ-কাল আমরা যাকে আজগুবি বলে থাকি।[৪২]

এখানে উদ্ধাচারি বলতে নাবী ﷺ-এর মিরাজ বা উর্ধ্ব গমনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এঙ্গেলসের মতে ধর্ম দর্শন ও মিরাজ এ সবই আজগুবি কথা। (নাউযু বিল্লাহ) মিরাজ বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত একটি বিষয়। আমরা যথা সময়ে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

রাশিয়ায় কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন তার লিখিত Religion গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন :

Aetheism is a natural and insparable part of Marxism cannot be conceive withoat Aetheism

নাস্তিকতা মার্কসবাদের স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অঙ্গ। নাস্তিকতা ছাড়া মার্কসবাদ কখনই বুঝা যেতে পারে না।

অন্যস্থানে লেনিন বলেছেন :

Down with Religion long live Aetheism the dessimination of Aethist viws is our chief

অর্থাৎ, ধর্মকে ধ্বংস করে দাও, নাস্তিকতা দীর্ঘজীবী হোক, নাস্তিকতার প্রচারই আমাদের প্রধান কর্তব্য।[৪৩]

লেনিন অন্যত্র আরো বলেন :

The Marxism must be a materialist i e an enemy of Religion.

মার্কসবাদী হতে হলে তাকে অবশ্যই জড়বাদী হতে হবে। অর্থাৎ তাকে হতে হবে ধর্মের শত্রু।[৪৪]

---

[৩৮] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৮৩*
[৩৯] *সূরা রা'দ, আয়াত : ১৫*
[৪০] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৮৫*
[৪১] *মার্কসীয় দর্শন : ২৩৫ পৃ.*
[৪২] *মার্কসীয় দর্শন : ২৩২ পৃ.*
[43] *Religion – ১৯*

অন্যত্র লেনিন বলেছেন : ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করায় বাধা নেই, কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে প্রচার করায় বাধা আছে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, নাস্তিকতাই হলো আধুনিক কমিউনিজমের আত্মা এবং নাস্তিকতার প্রচার ও প্রসারই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। বর্তমানে অফলাইন ও অনলাইনসহ সব মাধ্যমে নাস্তিকতার প্রচার তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

❁ ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম বিশ্বে নাস্তিকতার প্রবেশদ্বার : জার্মান, রাশিয়া ও চীনে কমিউনিজমের মাধ্যমে নাস্তিকতার বিস্তৃতি ঘটলেও মুসলিম বিশ্বে এ নামে প্রবেশ করাটা ছিলো অনেক কঠিন, তাই মার্কসবাদীরা মুসলিম বিশ্বের নাস্তিকতার বিস্তার ঘটানোর জন্য কমিউনিজম নামটি পরিবর্তন করে Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ নামে আত্মপ্রকাশ করে। Secularism এর বাংলা অর্থ করা হয় ধর্মনিপেক্ষতা। মূলত এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, ইহজাগতিক, ধর্মহীনতা, পার্থিব জীবন, জড়, জাগতিক ইত্যাদি।

এর অর্থ দাঁড়ায় Secularism বলতে ধর্মমুক্ত জীবন-যাপন, যার সংগে পারলৌকিক জীবনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ Secularism স্পষ্টতই নাস্তিকতা। এ মতাবাদটি সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আত্মপ্রকাশ করলেও মুসলিম বিশ্বে তার অনুপ্রবেশ মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮ খৃ.)-এর হাতে ঘটে। অতঃপর ১৯২৪ সালে তুরস্কে উসমানী খিলাফাতের পতন ঘটে। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে ক্ষমতা আরোহণের পর আযান, কুরআন শিক্ষা রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ করে দেয় এবং অসংখ্য কুরআন মাজীদ পুড়ে ফেলাসহ নানাবিধ ইসলামবিদ্বেষী কার্যকলাপ করতে থাকে। এর ফলে মুসলিম বিশ্বে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে নাস্তিকতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে। এরপর তা বিভিন্ন দেশ ঘুরে আমাদের বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের ১৯ শে মার্চে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি পায়।

সুতরাং বলাই যায়, শতকরা ৯০% পার্সেন্ট মুসলিমের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবেই নাস্তিকতাকে আশ্রয় প্রশ্রয় ও প্রচারণার সুযোগ দেওয়া হয়। তা না হলে শরিফ শরিফার গল্পের মতো শয়তানী আমাদের কোমলমতি সন্তানদের সামনে উপস্থাপিত হতো না।

❁ মুসলিম কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না : মুসলিম ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়া তো দূরের কথা ধর্ম কখনই নিরপেক্ষ হতে পারে না, বরং ধর্ম সবসময়ই ন্যায়ের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে। আর ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনো স্থান নেই। ইসলাম তার অনুসারী তথা মুসলিমদেরকে ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾

নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে সে অনুযায়ী আপনি মানুষদের মাঝে মীমাংসা করতে পারেন। আর আপনি খিয়ানতকারী বিতর্ককারীদের পক্ষাবলম্বন করবেন না।[৪৫]

আর রাসূল ﷺ বলেছেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

তোমাদের মধ্য হতে যে অন্যায় দেখবে সে যেন তা হাত দ্বারা প্রতিহত করে, তাতে যদি সক্ষম না হয় তাহলে যেন জবান দ্বারা প্রতিবাদ করে, তাতেও সক্ষম না হলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের সর্বনিম্নস্তর।[৪৬]

প্রতীয়মান হলো যে, ইসলাম নিজেই নিরপেক্ষ নয় বরং তা ন্যায়ের পক্ষ ও অন্যায়ের বিপক্ষ শক্তি। সুতরাং ইসলামে যেমন ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব নেই ঠিক তেমনই মুসলিম কখনোই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। আর নিরপেক্ষতা কখনোই আদর্শ হতে পারে না। তাই যদি হতো তাহলে ছোট কিংবা বড় কোনো অপরাধিকেই শাস্তির আওতায় নিয়ে আসাটা নীতিসিদ্ধ হতো না বরং নীতিবিরুদ্ধ হতো।

সুতরাং নিরপেক্ষতা কোনো আদর্শ নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো মতবাদ বা মতাদর্শ হতে পারে না বরং তা সুস্পষ্ট নাস্তিকতা।

এ Secularism বা ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে নাস্তিক্যবাদকে ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের প্রজন্মকে ধর্ম থেকে আলাদা করার ও ইসলামী চেতনাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত খুব জোরালোভাবেই চলছে। বিধায় বর্তমান সময়ের সব থেকে বড় ফিতনা হলো নাস্তিকতা। *(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

[৪৪] *Religion – ১২*

[৪৫] *সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১০৫*

[৪৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ৭৮*

সিয়াম কিভাবে আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি এনে দেয়

অধ্যাপক মোঃ আবুল খায়ের★

সিয়াম বা সওম আরবি শব্দ যার শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। ফার্সি ভাষায় এটাকে রোযা বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সম্ভোগ ও সিয়াম ভঙ্গকারী যাবতীয় বিষয় থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে সিয়াম বা রোযা। রমাযান মাসেই সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে এবং এটি ইসলাম ধর্মের অন্যতম একটি রোকন, যা ফরয হয়েছে দ্বিতীয় হিজরীতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বের সকল মুসলমানদের যারা জ্ঞানসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ এবং যারা নিজ এলাকায় অবস্থান করেন এরূপ প্রতিটি নর-নারীর ওপর রমাযান মাসে সিয়াম পালন করা ফরয করেছেন। এর প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

অন্যদিকে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন : যেটি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন : ইসলামের রুকন হচ্ছে পাঁচটি (১) এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত দেওয়া (৪) রমাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং (৫) সক্ষম ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা।[৪৭]

রাসূল ﷺ সিয়াম পালনকারীদের উদ্দেশ্যে একটি কঠোর বার্তাও দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সিয়াম পালনরত অবস্থায় মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারল না তার পানাহার পরিত্যাগ করায় (সিয়াম পালন করার) আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[৪৮]

রাসূল ﷺ আরো বলেন : পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম সিয়াম নয়, বরং সিয়াম হলো, অন্যায়, অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।[৪৯]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! সিয়ামের সংজ্ঞা এবং সিয়াম পালনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে যেটা বুঝা যায়, সিয়াম পালনের বিকল্প কিছু নেই। কারণ সিয়াম পালনের মাধ্যমেই আমরা ভালো ভালো কাজ করি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকি, শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে ও তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়ার লক্ষ্যে একটি ছোট সন্তানও রোযা রেখে লুকিয়ে কিছু খেয়ে ফেলে না; পানি দিয়ে কুলি করলে খুব সাবধানে করি যেন রোযা নষ্ট না হয়ে যায়। এটিই হচ্ছে তাকওয়ার প্রশিক্ষণ। অন্যান্য খারাপ কাজ থেকেও দূরে থাকতে হবে তা না হলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবেই সিয়ামকে রোযা আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি এনে দিতে পারে।

রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা অবশ্যই সততা অবলম্বন করবে। কেননা সততা মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। আর কল্যাণ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। কোনো মানুষ সদা-সত্য কথা বলতে থাকলে এবং সত্যের প্রতি মনোযোগী হলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে পরম সত্যবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। তোমরা অবশ্যই মিথ্যা পরিহার করবে, কেননা মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়; আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোনো বান্দা সদা মিথ্যা কথা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার প্রতি ঝুঁকে থাকলে শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর দরবারে ডাহা মিথ্যাবাদী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়।[৫০]

তাই রোযা রেখে এইভাবে হাদীসের অনুসরণের মাধ্যমে মানুষের মাঝ হতে মিথ্যা চলে গেলেই সে নিজের জীবনকে সুন্দরের দিকে এগিয়ে নিল। ফলে সমাজে এত প্রতারণাও থাকতো না এবং আমরা খুব সহজেই একটা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ লাভ করতে পারতাম। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু হাদীস পেশ করছি।

★ সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ, কলারোয়া।
সাতক্ষীরা ও খতীব মুরারী কাটি জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ।

[৪৭] সহীহ বুখারী, হা : ৮, সহীহ মুসলিম, হা : ১৬

[৪৮] সহীহ বুখারী, হা : ১৯০৩

[৪৯] সহীহ ইবনু খুযাইমা, হা : ১৯৯৬ সহীহ

[৫০] জামে তিরমিযী, হা : ১৯২১

(১) রাসূল ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত আছে। তেমনি দেহের যাকাত হচ্ছে রোযা।[৫১]

(২) ঝগড়া বিপদ থেকে বহু দূরে অবস্থান করা। রাসূল ﷺ বলেছেন, সিয়াম ঢালস্বরূপ। সুতরাং সিয়াম পালনকারী অশ্লীলতা করবে না এবং মুর্খের মতো কাজ করবে না। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করতে চায় বা তাকে গালি দেয়, তবে সে যেন দুই বার বলে, আমি সিয়াম পালন করছি।[৫২]

(৩) গীবত বা পরচর্চা থেকে দূরে রাখে সিয়াম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে বলেন :

হে ঈমানদারগণ! বেশি ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ। তোমরা অন্যের দোষ খোঁজাখুঁজি করো না; একে অন্যের অনুপস্থিতিতে দোষ ত্রুটি বর্ণনা করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো সেটাকে ঘৃণাই করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ খুব বেশি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু।

(৪) সিয়াম অন্যকে উপহাস করা থেকে বিরত রাখে । হে ঈমানদারগণ কোনো সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর নারীরা যেন অন্য নারীদেরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ না করে। হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যের নিন্দা করো না, একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নাম কতই না মন্দ, এ সব হতে যারা তওবা করে না তারাই যালিম।[৫৩]

দেখুন সিয়াম মানুষের মধ্যে সারাদিন না খেয়ে থাকা আত্মসংযমের মূল্যবান গুণ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ফলে এর মাধ্যমে যে কল্যাণ আসে তা হলো :

(১) সিয়াম মানুষদেরকে অতি ভোজন থেকে দূরে রাখে।

(২) ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট অনুভব করা যায়।

(৩) পেটের গোলযোগ ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় ও হজম শক্তি বৃদ্ধি করে।

(৪) উচ্চ রক্ত চাপ কমে যায়।

(৫) ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

(৬) গ্যাস্টিক আলসারের ব্যাথ্যা কমায় ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা কমায়।

(৭) বিভিন্ন রোগ থেকে হেফাজত করে; এলার্জি ও চর্মরোগ, সর্দি কাশি হাঁপানি ও বাত রোগ।

(৮) মহিলাদের অনিয়মিত মাসিকের সমস্যা দূর হয়।

(৯) কোলেস্টেরল কমায় : স্নায়ু সতেজ ও রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখে।

রাসূল ﷺ বলেছেন : মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কোনো পাত্র ভর্তি করে না। মেরুদন্ড সোজা রাখার জন্য কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও যদি বেশি দরকার হয় তবে পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।[৫৪]

রাসূল ﷺ বলেছেন : মুসলমান একটি উদর পূর্ণ করে খায়। আর কাফের খায় সাতটি উদর পূর্ণ করে।[৫৫]

(১০) সিয়াম যেনার কাজের গুনাহ থেকে দূরে রাখে : রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিৎ। কেননা বিয়ে চোখকে আমানতকারী ও গোপনাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সামর্থ্য নয় তার রোযা রাখা আবশ্যক। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত রাখে।[৫৬]

সম্মানীত পাঠকমণ্ডলী! জৈবিক চাহিদা আজকের সমাজে শয়তান একটি ভয়ঙ্কর অস্ত্র হিসাবে বাঁছে নিয়ছে যা দ্বারা আমাদের যুবক-যুবতী এমন কি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অর্থাৎ সব বয়সের মানুষদেরকে নানাভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এরই মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবেই- শয়তানের এই ওয়াদার বাস্তবায়ন করছে। অনেকে না বুঝে এই ফাঁদে পড়ে হিমসিম খাচ্ছে; আর এই অবস্থায় দেখা যায় ব্যক্তিগত ইবাদতেও স্বাদ পায় না এবং মনোযোগ দিতে পারে না। কুরআনের কথা মনকে স্পর্শ করে না।

---

[৫১] *ইবনে মাজাহ, হা : ১২৬ পৃ. মেশকাত, হা : ১৮০ পৃ.*
[৫২] *সহীহ বুখারী, হা : ১৮৯৪*
[৫৩] *সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১১*
[৫৪] *তিরমিযী, হা : ২৩২১*
[৫৫] *সহীহ বুখারী, হা : ৪৯৯৫*
[৫৬] *সহীহ বুখারী, হা : ১৭৭০*

এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, হে নবী! আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

অনুরূপ মহান আল্লাহ নারীদেরকেও বলেছেন, হে নবী! আপনি মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে।[৫৭]

আজকে আমাদের যুবসমাজসহ বয়স্ক অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে যেভাবে অন্যায় এবং হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এর ফলে গোটা সমাজ ব্যবস্থা আজ কলুষিত হচ্ছে। আর শয়তান এ সকল কাজে তাদেরকে আরো বেশি উৎসাহিত করছে। এহেন হারাম ও গুনাহের কাজে জড়িত অবস্থায় যদি মৃত্যুর ফেরেশতা এসে যায় জান কবয করতে তাহলে তাদের অবস্থা কোথায় হবে যা ভাবলেই শরীর শিউরে উঠে। জীবনের পরিধি যেখানে কোনো নির্দিষ্ট নেই, যে কোনো অবস্থায় আপনার আমার কবরে যাওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠতে পারে। তাই প্রতিটা মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এ জন্য সিয়ামই আমাদের মধ্যে সেই তাকওয়া এনে দেয় যা যাবতীয় অন্যায়, কাজ গুনাহের কাজ; যাবতীয় পাপের কাজ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর জীবনকে আদর্শ হিসেবে নিতে এবং তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই শ্রবণ দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।[৫৮]

সূরা আল মুমিন-এর ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ আবার বলেছেন : চোখের চুরি ও অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।

সম্মানীত পাঠকমন্ডলী! ওপরের হাদীস ও কুরআনের আয়াত থেকে আমরা স্পষ্টত বুঝতে পারছি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কত সুন্দরভাবে পরিবার তথা গোটা সমাজ গড়ার পথ দেখিয়েছেন। এভাবে আমাদের সমাজে যদি প্রত্যেক নারী-পুরুষ যার যার অবস্থান থেকে শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে পরিচালনা করতো তবে নিঃসন্দেহে বিনা খরচে, খুব সহজেই স্থায়ীভাবে সুন্দর হত প্রত্যেকটি পরিবার। আর প্রত্যেকটি পরিবার সুন্দর হলেই সুন্দর হত গোটা সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র। ❐❑

[৫৭] *সূরা আন-নূর, আয়াত : ৩১*
[৫৮] *সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬*

মহামারী ভাইরাস

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক

থমথমে পুরো দেশ গমগমে শহর
জোর যার সব তার দেখি সেই খবর ;
কোটি টাকা করে চুরি খুন শতশত
হেসে হেসে করে চলে অন্যায় যত।
রক্তে স্নান করে ফেলে মিঠা জল
বুক চাপড়ে ছুটে চলে যেন বীরবল ;
হাতে পেলে ক্ষমতা লুটেপুটে খায়
পেট তবু ভরে না হা করে চায়।
মিথ্যা বচনে মাইক দেয় ফাটিয়ে
বসে থেকে টাকা পায় কেউ মরে খাটিয়ে ;
পথেপথে ঘুরাঘুরি হাতে হাতে অস্ত্র
আইনের কালো চোখে এরা সাদা বস্ত্র।
মিথ্যার বেড়াজালে সত্যকে ঢাকে
চোরের বড় গলা বাঘ যেন ডাকে ;
রাজনীতির পোশাকে খেয়ে যায় গোশ-মাছ
দেশের তরে এরা আজ মহামারী ভাইরাস।

এমন ছেলে

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

যে ছেলেটির ঘুম ভাঙে রোজ
ফজর আজান হলে,
বিছানা ছেড়ে ওজু করে
মসজিদে যায় চলে।
মিথ্যা কথা বলে না কোথাও
রঙ তামাশার ছলে,
বাবা মায়ের কথা শুনে,
হকের পথে চলে।
গরীব দুখীর খোঁজ রাখে যে
পাঠেও ভীষণ মন,
এমন ছেলে আমার দেশে
খুব-ই প্রয়োজন।

যাকাত সংক্রান্ত মাসায়িল

তাওহীদ বিন হেলাল❖

যাকাত আপাতদৃষ্টিতে সম্পদ কমিয়ে ফেলে মনে হলেও সামাজিকভাবে এর স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী সুফল রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে অশান্তির অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। অবাক করা বিষয় হল, সম্পদের স্বল্পতা নয়, বরং কতিপয় মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত থাকাই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই এ প্রবন্ধে যাকাতের স্বরূপ, উপকারিতা, প্রায়োগিক রূপ ও উপযোগিতা ধর্মীয় এবং বাস্তবিক তত্ত্বের আলোকে পর্যালোচনা করা হবে।

১. যাকাতের পরিচয় :

যাকাতের শাব্দিক অর্থ অনেক। যথা :

البركة (বরকতময় হওয়া)

النماء (প্রবৃদ্ধি)

الطهارة (পবিত্রতা)

الصلاح (পরিশুদ্ধতা) ইত্যাদি।

যাকাতের পারিভাষিক পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়েছে,

حصة مقدرة، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، يصرف في جهات مخصوصة.

অর্থাৎ নির্ধারিত সম্পদ (নিসাব পরিমাণ) থেকে নির্দিষ্ট অংশ উপযুক্ত সময়ে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।[৫৯]

২. যাকাতের হুকুম :

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তপূরণকারী প্রত্যেক মুসলিমের ওপর যাকাত দেওয়া ফরয।[৬০]

৩. যাকাত আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ :

ক. যাকাতের প্রথম শর্ত মুসলিম হওয়া। কেননা এটি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

"তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় কর যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"[৬১] এ আয়াতের নির্দেশ মুসলিমদের জন্য, অমুসলিমদের জন্য নয়।

খ. বালেগ হওয়া। শরী'আহ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই যাকাত আদায়ের জন্য বালেগ হওয়া ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ মতে শিশুর যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তো তা থেকে যাকাত প্রদান করা তার ওলীর ওপর আবশ্যক।

গ. নিসাবের মালিক হওয়া। অর্থাৎ নিসাবের পরিমাণ পূর্ণ করে তার ওপর যাকাত দিতে হবে।

ঘ. নিসাব জীবন যাত্রায় অপরিহার্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া।

ঙ. নিসাব পরিমাণ মালের এক বছর পূর্ণ হতে হবে। জীবন যাত্রার অপরিহার্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের স্থায়ী মালিকানার অধিকারী হওয়া।[৬২]

৪. যাকাত, সাদাকাহ ও করের মধ্যকার পার্থক্য :

আমরা অনেক সময় যাকাত, কর ও সাদাকাহ একই ভেবে থাকি। কিন্তু যাকাত ও সাদাকাহ-এর মাঝে একটু পার্থক্য আছে। কোনো সম্পদশালী ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দিলেই ইসলাম তাকে যাবতীয় সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত বলে মনে করে না; বরং সম্পদশালীদের জন্য জাতীয় ও সামাজিক প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সম্পদ ব্যয়ের অন্য একটি দায়িত্ব মুমিনদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে, যাকে পরিভাষায় সাদাকাহ বলা হয়। আর সরকারকে নির্দিষ্ট বাৎসরিক আয়ের ওপর কর প্রদান করতে হয়। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে এই তিনটি পার্থক্য উপস্থাপন করা হল।[৬৩]

❖ *অধ্যয়নরত, উম্মুল কোরা ইউনিভার্সিটি, মক্কা মুকাররমা।*
বি.এ. এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়া।

[৫৯] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, খণ্ড : ২, যাকাত অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ০৫*

[৬০] *প্রাগুক্ত, পৃ, ০৫*

[৬১] *সূরা আত-তাওবা, আয়াত : ১০৩*

[৬২] *ইসলামের যাকাত বিধান, (১ম খণ্ড) পৃ. ৪৬৪*

[৬৩] *অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাত ব্যবস্থাপনার সুফল পৃ. ১৪*

ক্র.	যাকাত	কর	সাদাকাহ
১	যাকাত আল্লাহর নির্দেশিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ	সরকার আরোপিত বাধ্যতামূলক প্রদেয় অর্থ	আল্লাহ নির্দেশিত ঐচ্ছিক প্রদেয় অর্থ
২	নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বে সঞ্চিত সম্পদের ওপর আরোপি লেভী	আয়ের ওপর লেভী	আদৌ সে রকম নয়
৩	প্রদান করতে ২.৫% সম্পদ বা সমপরিমাণ অর্থের প্রয়োজন	প্রদান করতে অর্থের প্রয়োজন	আবশ্যিকভাবে অর্থের প্রয়োজন নেই। সম্পদ ও আচরণও হতে পারে।
৪	আল-কুরআনে নির্দেশিত খাতেই ব্যয় করতে হবে	আদায়কৃত অর্থ সরকার যে কোনো কাজে ব্যয় করতে পারে	সুনির্দিষ্ট কোনো খাতের উল্লেখ নেই, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করতে হবে
৫	সুনির্দিষ্ট নিসাব উল্লেখ রয়েছে যার পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় না	প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম সীমা পরিবর্তন হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে কোনো সীমাই নেই।	কোন রকম সুনির্দিষ্ট সীমা নেই

এছাড়াও আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে এ তিনটির মধ্যে।

৫. যে সকল মালের যাকাত ফরয :

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সেই সম্পদের কিছু অংশ গরীবদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তবে সকল সম্পদের ওপর যাকাত ফরয করেননি। বরং পাঁচ প্রকার মালের যাকাত আদায় করার নির্দেশ এসেছে। যা নিম্নরূপ-

(৫. ১) **بهيمة الأنعام** তথা গৃহপালিত পশু : কারো নিকট গৃহপালিত পশু নিসাব পরিমাণ থাকলে তার ওপর যাকাত আদায় করা ফরয। আর তা হল, (ক) উট, (খ) গরু ও (ঘ) ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا إِلاَّ أُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

'প্রত্যেক উট, গরু ও ছাগলের অধিকারী ব্যক্তি যে তার যাকাত আদায় করবে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আনা হবে বিরাটকায় ও অতি মোটাতাজা অবস্থায়। তারা দলে দলে তাকে মাড়াতে থাকবে তাদের ক্ষুর দ্বারা এবং মারতে থাকবে তাদের শিং দ্বারা। যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে, পুনরায় প্রথম দল এসে তার সাথে এরূপ করতে থাকবে, যাবৎ না মানুষের বিচার ফায়সালা শেষ হয়ে যায়।[৬৪]

(৫. ২) **النقدان** তথা স্বর্ণ ও রৌপ্য : কারো নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকলে অথবা এর সমপরিমাণ অর্থ থাকলে তার ওপর যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। সেদিন বলা হবে, এটা তাই, যা তোমরা

[৬৪] *সহীহ বুখারী, হা : ১৪৬০, সহীহ মুসলিম, হা : ৯৯০*

নিজেদের জন্য সঞ্চয় করতে। সুতরাং তোমরা যা সঞ্চয় করেছিলে তা আস্বাদন কর।[৬৫]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيْلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'প্রত্যেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মালিক যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না, নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের বহু পাত তৈরি করা হবে এবং সে সমুদয়কে জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে এবং তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে তখন পুনরায় তাকে গরম করা হবে (তার সাথে এরূপ করা হবে) সে দিন, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) যতদিন না বান্দাদের বিচার নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর সে তার পথ ধরবে, হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে'।[৬৬]

(৫. ৩) عروض التجارة তথা ব্যবসায়িক মাল : যে সকল মাল লাভের আশায় ক্রয়-বিক্রয় করা হয় সে সকল মালের যাকাত ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর এবং এর নিকৃষ্ট বস্তুত ব্যয় করার সংকল্প কর না; অথচ তোমরা তা গ্রহণ করবে না, যদি না তোমরা চোখ বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত'।[৬৭]

অত্র আয়াতে বর্ণিত مَا كَسَبْتُمْ অর্থাৎ 'তোমরা যা উপার্জন কর' দ্বারা ব্যবসায়িক মালকে বুঝানো হয়েছে।

(৫. ৪) **الحبوب والثمار** তথা শস্য ও ফল : অর্থাৎ যে সকল শস্য ও ফল গুদামজাত করা যায় এবং ওজনে বিক্রি হয় সে সকল শস্য ও ফলের যাকাত ফরয। যেমন- গম, যব, খেজুর, কিসমিস ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- এগুলো একে অপরের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তুলবার দিনে তার হক (যাকাত) প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না।[৬৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

'বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা নালার পানিতে উৎপন্ন ফসলের ওপর 'ওশর' (দশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর 'অর্ধ ওশর' (বিশ ভাগের এক ভাগ) যাকাত ওয়াজিব'।

(৫. ৫) **المعادن والركاز** তথা খনিজ ও মাটির ভেতরে লুক্কায়িত সম্পদ : **المعادن** হল খনিজ সম্পদ, যা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখেছেন। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা ইত্যাদি। আর **الركاز** হল পূর্ববর্তী যুগের মানুষের রাখা সম্পদ, যা মানুষ মাটির ভেতরে পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৬৫] *সূরা আত-তওবা আয়াত : ৩৪-৩৫*
[৬৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ৯৮৭*
[৬৭] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬৭*
[৬৮] *সূরা আন'আম, আয়াত : ১৪১*

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

'হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।[৬৯]

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ভূমি হতে উৎপাদন বলতে শস্য, খনিজ সম্পদ ও মানুষের লুকিয়ে রাখা সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

'চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত। কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মারা গেলে মালিক) দায়মুক্ত। রিকাযে (মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ) এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬. যাকাত বিতরণের খাতসমূহ :

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে আট শ্রেণীর লোককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাদের মধ্যে যাকাত বন্টন করে দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

'এ সাদাকাগুলো তো আসলে ফকীর-মিসকীনদের জন্য আর যারা সাদাকা সংক্রান্ত কজে নিযুক্ত এবং যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য। তাছাড়া দাসমুক্ত করার, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করার, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিধান এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন। তিনি বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ'।[৭০]

এ আয়াতে যাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নে তাদের বিবরণ দেওয়া হলো :

৬. ১. (আল-ফুকারা) দরিদ্র জনগণ : ফকীর এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের জীবিকার ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী। কোনো শারীরিক ত্রুটি বা বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে অথবা কোনো সাময়িক কারণে কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে এবং সাহায্য সহায়তা পেলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, এ পর্যায়ে সব ধরনের অভাবী লোকের জন্য সাধারণভাবে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬. ২. (আল-মাসাকীন) অভাবী : বাংলাদেশে উল্লিখিত ফুকারাউ মাসাকীনকে একযোগে ফকীর-মিসকিন বলা হয়। দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণির লোক তারাই যাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। তাদের নিসাব পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বা ধনসম্পদ তো দূরে থাক, প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, কাজের সরঞ্জাম, গবাদিপশু ইত্যাদির অভাব প্রকট। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সকলেই যাকাত পাওয়ার যোগ্য বা দাবিদার। ইসলামী সাহিত্যে এ শব্দদ্বয়ের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে।

৬. ৩. যাকাত বিভাগে নিযুক্ত কর্মচারী : এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সুতরাং তাদের বেতন এই উৎস থেকেই দেওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, রাসূল ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়ে যাকাতের অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী ও গবাদিপশু সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য আট শ্রেণির লোক নিযুক্ত ছিল। এরা হলো :

ক. সায়ী = গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক

খ. কাতিব = করণিক

গ. ক্বাসেম = বণ্টনকারী

ঘ. আশির = যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনকারী

ঙ. আরিফ = যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী

চ. হাসিব = হিসাব রক্ষক

ছ. হাফিয = যাকাতের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষক

[৬৯] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৬৭*
[৭০] *সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ৬০*

জ. কাইয়াল = যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণকারী ও ওজনকারী।

৬. ৪. যাদের মন জয় করা প্রয়োজন : মন জয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্য যে বিধান রয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, যারা ইসলামের বিরোধিতায় ব্যাপকভাবে তৎপর এবং অর্থ দিয়ে যাদের শত্রুতার তীব্রতা ও উগ্রতা হ্রাস করা যেতে পারে।

৬. ৫. দাসমুক্ত করার জন্য।

৬. ৬. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ আদায় : ঋণগ্রস্ত তারাই যারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ করে কিন্তু তা পরিশোধ করতে পারে না। এদের ঋণ পরিশোধের জন্যও যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হতে পারে।

৬. ৭. আল্লাহর পথে বলতে আল্লাহর পথে জিহাদ বুঝিয়েছেন।

৬. ৮. মুসাফিরদের জন্য : যাকাতের অর্থ তাদেরকেও দেওয়া যাবে যারা মুসাফির।[৭১]

যেহেতু যাকাত সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে সহায়ক তাই যাকাত বন্টনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, প্রতি বছর কয়েকজনের যাকাত একত্র করে একজনকে স্বাবলম্বী করার নিমিত্তে তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম প্রস্তুত করে দেওয়া। অধিকাংশ আলেম এমন পদ্ধতি পছন্দ করেছেন।

৭. যাকাত অস্বীকারকারীর হুকুম :

সকল আলেম একমত যে, যাকাতের আবশ্যকতাকে অস্বীকারকারী কাফের এবং কুরআন ও সুন্নাহকে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী।

সম্পদ গচ্ছিতকারীর জন্য কুরআনে কঠিনভাবে শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

'যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। আর বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জীভূত করতে। সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করেছিলে তা আস্বাদন কর।[৭২]

হাদীসে এসেছে যাকাত ত্যাগকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ-

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যাকাত ত্যাগকারী ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৭৩]

অতএব যাকাত প্রদান করা যেমন ফরয তেমনি যাকাতের ফরযিয়াত অস্বীকার করা বা সাহেবুন নিসাব হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হে পাঠকবৃন্দ!

আমাদের মাঝে রমাযান আসন্ন। এই মহিমান্বিত মাসে যাকাত সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করে তা আদায় করার সামর্থ হলে যথাযথ যাকাত আদায় করে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভকে সমাজে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, রোজা হলো ঢালস্বরূপ বান্দা এর দ্বারা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে।

(আহমদ হা : ১৪৬৬৯)

[৭১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৯*

[৭২] *সূরা আত-তওবা, আয়াত : ৩৪-৩৫*

[৭৩] *সহীহ তারগীব, হা : ৭৬২; সহীহুল জামে' হা : ৫৮০৭*

নব্য জাহেলীয়াত

সাইদুর রহমান*

১. মেয়ে সন্তান হলে মনঃক্ষুণ্ন হওয়া : জাহেলী যুগে একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক উৎফুল্লতার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করছে। আশানুরূপের চেয়ে বেশি লাভ হওয়ায় রীতিমতো তার মনটা বেশ পুলকিত। বহুদিন পর ব্যবসায়ে লাভের মুখ দেখেছে। বেঁচে যাওয়া পণ্য নিয়ে প্রফুল্ল মন নিয়ে বাড়ির পথ ধরেছে। আজ তার চলার ভঙ্গিই ভিন্ন রকম। তার মনে যে আনন্দের স্নিগ্ধ হাওয়া দোল খাচ্ছে তা তার চালচলন দেখেই আঁচ করা যাচ্ছে। ওই তো তার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটু বাদেই দেখা মিলবে প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে। বলবে বলে মনের মাঝে অনেক কথাই লুকিয়ে রেখেছে। অনেক দিন পর বাড়িতে যাচ্ছে। বাড়ির অদূর থেকে এক লোক গলা ছেড়ে চিৎকার করে ডাকছে, 'ওই ভাই, ওই ভাই'। আওয়াজটা বেশ চেনাচেনা লাগছে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে দ্রুত আসছে। কাছে আসতেই চিনতে আর বাকি নেই। 'কী রে, তোর কী হয়েছে'? 'ভাই, খুশির সংবাদ! আপনার স্ত্রী, মানে আমাদের ভাবী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে'! 'যাহ! এটা কোনো খুশির সংবাদ হলো! দিলি তো তুই আমার মুডটা নষ্ট করে'! মুহূর্তেই তার চেহারায় মলিনতা এসে ভিড় জমায়। এখন তার চেহারা ধারণ করেছে ধূসর বর্ণের রূপ। একটা বিদ্ঘুটে চেহারা ও বিরক্তিভরা সুর নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। স্ত্রীকে আর কী ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করবে। তার মেজাজে যে আগুন লেগেছে! বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেই বলছে, 'এই সংবাদ শোনার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন? আমি এখন মুখ লুকাবো কোথায়? সবাই আমাকে অপয়া বলবে। আমার বংশ খাটো হবে। আমি যদি এখন মাটির নিচে চলে যেতে পারতাম! অথবা চলে যেতে পারতাম অজানা কোনো রাজ্যে, যেখানে আমাকে কেউ চিনতে পারবে না। বলবে না আমাকে কোনো কটু কথা'। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে এভাবেই কন্যার বাবা বিলাপ করতো। কুরআন এই চিত্রটাই এভাবে নিয়ে এসেছে,

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয় তার গ্লানির কারণে সে নিজ সম্পদায় থেকে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও কি তাকে রেখে দেবে নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট![৭৪]

প্রিয় পাঠক! এই চিত্রটাকে আপনি শুধু জাহেলী যুগের সাথে রেখে দিচ্ছেন? মনে মনে ভাবছেন জাহেলী যুগের মানুষ কত খারাপ ছিল! বিস্ময়বোধ করছেন আপনি? আপনার চোখ তো চড়কগাছ হবে, যদি আমি আঙুল উঁচিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দেই আপনার পাশের বাড়িতে জাহেলী যুগের এই কাজ হচ্ছে! আপনার চাচাতো ভাই তার স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করছে। প্রথম কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের পর পরের সন্তানও কন্যা হওয়ার কারণে আপনার চাচাতো ভাই তার স্ত্রীকে মারধোর করছে। কষিয়ে গালে থাপ্পড় বসিয়ে দিয়েছে! দেখে আসার জন্য আপনি এখন আপনার ছোট বোনকে পাঠান। এখনো তার গালে পাঁচ আঙুলের দাগ রয়ে গেছে। এখনো আমাদের মাঝে জাহেলী যুগের কাজ বিদ্যমান আছে। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমরা মনঃক্ষুণ্ন হই। আত্মপীড়ায় ভুগতে থাকি। নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে অপয়া, অশুভ মনে করি। অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করি। শরীরের সবটুকু শক্তি ব্যয় করে তাকে বেদম প্রহার করি। তার আত্মীয়স্বজন, বংশ নিয়ে গালিগালাজ করি। ওই সময় আপনার স্ত্রী অঝোরে লোকচক্ষুর আড়ালে অশ্রুবৃষ্টি বর্ষণ করে। ভেতরের দহন যন্ত্রণার কথা কারো কাছে বলতে পারে না। শুধু নিরবে নিভৃতে একা একা কাঁদে, যা তার রব ও সে জানে। অনেক অযোগ্য, মূর্খ স্বামী একধাপ এগিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। সোজাসাপ্টা তালাক দিয়ে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। এই স্বামী, আপনার মাঝে জাহেলী যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। আপনি মূর্খ, আপনি ভরভর। আপনার স্ত্রী কি নিজ থেকে কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছে? সন্তান হওয়ার পেছনে কি তার কোনো হাত আছে? তার হাতে যদি ছেলে মেয়ে হওয়ার ক্ষমতা থাকতো তাহলে সে কি কখনো মেয়ে সন্তান জন্ম দিতো? সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে এটা তো আল্লাহর হাতে,

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

* দাওরায়ে হাদীস, এম এম আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[৭৪] সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৫৮-৫৯

আসমানসমূহ ও জমিনের আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা রাখেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান।[৭৫]

আপনার মাঝে কি একটু দ্বীনের জ্ঞান নেই? কীভাবে আপনি নির্লজ্জের মতো আপনার স্ত্রীকে মারছেন? অনেক পুরুষকে দেখেছি, দেখেছে আমার চক্ষুদ্বয় তিনটা মেয়ে সন্তান হওয়ার কারণে তাকে তালাক দিয়ে আরেক নারীকে বিয়ে করেছে। আমি আবারও বলছি আপনার মাঝে জাহেলী যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য আছে। এখনই স্ত্রীর কাছে মিনতি করে ক্ষমা চান। বলুন, আমার ভুল হয়ে গেছে আমাকে ক্ষমা করো। আমার ওপর বিতাড়িত শয়তান জয়লাভ করে। তাই আমি তোমাকে মেরেছি।

প্রিয় ভাই! আমি হলফ করে আপনাকে একটা কথা বলছি, এই কন্যা সন্তান আপনার ঘরের বরকতের কারণ হবে। আপনার রুজিরোজগার বৃদ্ধি পাবে। আর অবশ্যই এটা হবেই। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনাকে অনেক টাকা পয়সা দান করবেন। কারণটা জানেন কী? নারীরা হচ্ছে দুর্বল। আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের রিযিক দিবেন। আপনার কি মনে আছে, বিয়ের আগে জানি আপনি মাসে কত টাকা ইনকাম করতেন? হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে। বিয়ের পর দেখুন তো আপনার এই বাড়তি টাকা কোত্থেকে আসছে? এখন আগের তুলনায় একটু বেশি ইনকাম হয়। কেন হয়, কীভাবে হয়, কার জন্য হয় কোনো দিন কি চিন্তার দরিয়ায় অবগাহন করেছেন? মধ্যরাতে কি ভেবেছেন কীভাবে এখন বেশি টাকা ইনকাম হয়? আগে তো এতো পরিশ্রম খাটুনি করেও এতো টাকা ইনকাম করতে পারতাম না! আপনার স্ত্রী যখন তার বাবার কাছে ছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তার রিযিকটা তার বাবার মাধ্যম দিয়েছেন। এখন সে আপনার স্ত্রী, তাই আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তার রিযিক দিচ্ছেন। সে জন্যই এখন আপনি বেশি টাকা ইনকাম করতে পারেন। আপনার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তার রিযিক আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে দেবেন। তাই রিযিক নিয়ে কখনো দুশ্চিন্তায় থাকবেন না।

একটা কথা মনের মাঝে গেঁথে রাখুন। নবী-রাসূলরা হচ্ছেন কন্যার বাবা। আমাদের প্রিয় নবীর চারজন কন্যা সন্তান ছিল। আপনি কি নবী ﷺ থেকে ভালো মানুষ? তাঁর যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে আপনার হলে সমস্যা কী? নবী রাসূলদের মতো আপনিও কন্যা সন্তানের বাবা। এই লকব পেতে কি আপনার মন সায় দেয় না? কখনো চিন্তা করবেন না। দেখুন, আমাদের প্রিয়নবী ﷺ আপনাকে কত বড়ো বড়ো উপহার দিচ্ছেন।

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ - كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কেয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।[৭৬]

مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ .

কোনো ব্যক্তির দু'টি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[৭৭]

আপনি যে আপনার স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন, বলুন তো তিনি ছেলে নাকি মেয়ে? অবশ্যই তিনি মেয়ে। কারণ ছেলে মানুষকে তো আর কেউ বিয়ে করে না। এখন কথা হচ্ছে, সবার যদি শুধু ছেলে সন্তান হয় তাহলে এই ছেলেরা বিয়ে করবে কাদের? মেয়ে পাবে কোথায়? এজন্যই আল্লাহর সৃষ্টির কারিশমা বড়ই নিখুঁত। তিনি কাউকে ছেলে আবার কাউকে মেয়ে আবার কাউকে দুটিই দান করেন।

আপনাকে আমি একটা ভরসার বাণী শোনাচ্ছি। আপনার চারজন কন্যা সন্তান আছে? কোনো টেনশন নেই। আপনি অন্তত নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হবে না, লুটোপুটি খেতে হবে না বৃদ্ধ বয়সে মলমূত্রের সাথে। আপনার অসুখ-বিসুখ হলে এই কলিজার টুকরোরা দুর্বার গতিতে আপনার কাছে ছুটে আসবে। আপনার ক্ষীণকায় দেহের যত্ন নেবে, ময়লা কাপড় ধুয়ে দেবে, অপরিচ্ছন্ন অপরিপাটি ঘরদোর পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে দিবে। ছয় ছেলের বাবা-মা কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমে আছে। কিন্তু ছয় মেয়ের বাবা-মা বৃদ্ধাশ্রমে নেই। একজন না একজন আপনাকে ঠাঁই দেবেই। নয় কন্যা সন্তানের মাকে দেখেছি আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়ে নাতিপুতি নিয়ে খুব ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছেন। আবার এও দেখেছি চার ছেলের মা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে চলছে।

[৭৫] *সূরা শূরা, আয়াত : ৪৯-৫০*

[৭৬] *ইবনে মাজাহ, হা : ৩৬৬৯*

[৭৭] *ইবনে মাজাহ, হা : ৩৬৭০*

তাই আপনাকে বলছি আপনি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। এটা জাহেলী যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্য। আপনার মাঝে যেন এই বৈশিষ্ট্য না থাকে।

অনেক বাবা তো কন্যা সন্তানকে রাগ করে লেখাপড়াই করান না। বলেন, মেয়ে মানুষ এতো লেখাপড়া করে কী হবে! যতোই লেখাপড়া করুক, দিনশেষে পাতিল মাস্টার। মানেটা মনে হয় আপনি বুঝেননি। যত শিক্ষিত নারীই হোক তাকে কিন্তু রান্নাবান্না করতে হয় এটাই বুঝাতে চাচ্ছেন তিনি। ছেলেকে স্কুলে পড়ান, বিকেলে বাড়িতে শিক্ষক রেখে আলাদাভাবে পড়ান, তার জন্য আলাদা যত্ন, কিন্তু মেয়ের বেলায় একেবারে অনিহা প্রকাশ করেন। বলেন, ক্লাস নাইনের পরেই বিয়ে দিয়ে দিবো। এত্ত লেখাপড়ার দরকার নেই। আমি একটা লোককে দেখেছি, তার তিনটা মেয়ে ছিল। কোনো ছেলে ছিল না। বড় মেয়েকে পনেরো বছর বয়সে আর মেঝ মেয়েকে এগারো বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, মেয়ে মানুষ এতো লেখাপড়া করে কী হবে! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপদ বিদায় করা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, তাদের মতামত না নিয়ে, বয়সে তাদের দুইগুণ বড় ছেলের সাথে তাদের বিয়ে দিচ্ছে! আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন! প্রিয় ভাই! আপনাকে একটা কথা বলি, আপনি যদি বুখারীর জগদ্বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী পড়েন তাহলে সেখানে দেখতে পাবেন হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহি) তার কিতাবে প্রায় জায়গায় একটা বর্ণনা এভাবে নিয়ে এসেছেন, 'কারিমার বর্ণনা অনুযায়ী এমন'। এর মানে হচ্ছে কয়েকজন মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহি)-এর কিতাবের পাণ্ডুলিপি লেখেছেন। তাদের মাঝে একজন হচ্ছেন কারীমা। তিনিও পান্ডুলিপি লেখেছেন। তার পাণ্ডুলিপিতে বর্ণনাটা এভাবে এসেছে, সুবহানাল্লাহ ! একজন মেয়ে মানুষ মুহাদ্দিসা! আপনি কি কল্পনা করতে পারেন? একজন মেয়ে কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে করলে মুহাদ্দিসা হতে পারেন! আমি প্রায়ই কারীমা নাম্নী এই মুহাদ্দিসা মেয়েকে নিয়ে ঈর্ষা করি। ইস! আমি যদি তার মতো হতে পারতাম! হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানী (রহি)-এর মতো এত বড় একজন বিদ্বান কত সম্মানের সাথে তার নাম উল্লেখ করতেন। আহ! আমার মেয়ে যদি এমন হতো! আপনার কি মন চায় না আপনার মেয়ে এমন হোক? আমার তো খুব মন চায়, হায় আল্লাহ! আমার মেয়ে যদি এমন হতো! আপনার মেয়ে হয়েছে এজন্য তাকে অবহেলা করে রেখে দিয়েন না। তাকে পড়ালেখা করান। সেও যোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। দেখুন দেশে বর্তমানে ভুরি ভুরি নারী যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তার আছে। একটা সময় সিজার করার জন্য নারী ডাক্তার পাওয়া যেত না। এখন আল-হামদুলিল্লাহ অনেক পাওয়া যায়! আপনার কি মনে চায় না আমার মেয়ে মানুষের অন্তরের ডাক্তার হবে! মানুষের দেহের রোগ নির্ণয় করার জন্য তো কত নারী ডাক্তার আছে! আমার মেয়েটা মানুষের অন্তরের রোগ নির্ণয় করবে! আমার মেয়েটা কারীমার মতো জগদ্বিখ্যাত বিদুষী হবে! আমার মেয়ে মানুষের অন্তরের চিকিৎসা করবে! আজ নারীদের মাঝে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতি নেই বললেই চলে! কিন্তু অসংখ্য ডাক্তার আছে! আপনি আপনার মেয়েকে মুহাদ্দিসা বা মুফাসসির অথবা মুফতি বানান! নারীদের গোপন অনেক মাসাআলা তারা চোখলজ্জায় অনেক সময় আলেমদের কাছে বলতে পারে না। আপনার মেয়েকে মুফতি বানান। বাড়িতে বসে বসে আপনার মেয়ে নারীদের গোপন মাসাআলাগুলোর সমাধান দেবে! শুনুন, আমাদের মা আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কিন্তু নারী ছিলেন! তিনি কিন্তু মুহাদ্দিসা ছিলেন। তার সময়ে বড় বড় সাহাবী, তাবেঈ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তাদের কাছে ওই বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে সরাসরি চলে যেতেন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে। তিনি সুন্দর করে দলীলের আলোকে বুঝিয়ে দিতেন। আপনি আপনার মেয়েকে নারীদের জন্য একটা আদর্শ রেখে যান। প্রিয় পাঠক! মেয়ে দেখে আপনার কলিজার টুকরোকে অবহেলা করবেন না। নাক ছিটকাবেন না। তাকে যোগ্য করুন। জাহেলী যুগের মানুষের মতো আপনি আচরণ করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা আপনার সহায় হোন। আমীন

২. মেয়ে সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা : জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। এই আলোচনাটা শুরু করার আগে কে সর্ব প্রথম জাহেলী যুগে কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করে ও কীভাবে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো সে ইতিহাস জানা সমীচীন মনে করছি।

জীবন্ত কন্যা সন্তান সর্বপ্রথম প্রোথিত করে কায়েস ইবনু আছেম আত-তামীমী। এর কারণ হলো- তার কোনো এক শত্রু সহসাই তার ওপর হানা দেয়। এতে তার মেয়ে বন্দি হয়ে তার অধীনে চলে যায়। অর্থাৎ সে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর তাদের মাঝে একটা সন্ধি হয়। এরপর কায়েস তার মেয়েকে স্বাধীনতা দেয় সে ইচ্ছা করলে তার শত্রু (মেয়ের স্বামী)-এর সাথে থাকবে অথবা তার সাথে থাকবে। তার মেয়ে তার স্বামী (কায়েসের শত্রু) কে গ্রহণ করে। এতে কায়েস যারপর নাই ক্রোধান্বিত হয়ে শপথ করে,

'এরপর থেকে তার যত মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে সে জীবন্ত প্রোথিত করবে। তারপর থেকেই আরবরা তার এই রীতি গ্রহণ করে। সাসায়া ইবনু নাজিয়াহ আত-তামীমী সে ছিল আবার কায়েসের সম্পূর্ণ উল্টো। সে মুক্তিপণ দিয়ে মেয়েদের রক্ষা করতো। সে যদি শুনতে পেত কোথাও মেয়ে সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা হবে। সে হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে গিয়ে ওই লোককে বলতো তুমি তাকে জীবন্ত প্রোথিত করো না। তার বিনিময়ে আমি তোমাকে এতো দিরহাম দিবো। তারপর চুক্তি অনুযায়ী দিরহাম দিয়ে সে এভাবে মেয়েদের রক্ষা করতো। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এদুজনই ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর সুহবাত পেয়ে ধন্য হন। আলহামদুলিল্লাহ।

জাহিলী যুগে মেয়েদের দু'ভাবে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। (১) সন্তান প্রসবের পূর্বে স্বামী বলতো এই যে, কূপের সন্নিকটে সন্তান প্রসব করবে। মেয়ে হলে আর কথা নেই। সাথে সাথে কূপে ফেলে দিবে। আর ছেলে হলে সযত্নে নিয়ে আসবে।

(২) স্বামী বলা নেই কওয়া নেই একদিন হুট করে স্ত্রীকে এসে বলতো-এই শুনছো, তোমার মেয়েকে দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে দাও! তাকে নিয়ে যে আমি নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাবো। আমার মেয়ে বলে কথা। অপরিচ্ছন্ন থাকলে কি হয়! তারপর স্ত্রী মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে। মরুভূমিতে নিয়ে গিয়ে গভীর কূপের সন্নিকটে দাঁড় করাতো। তারপর বলতো, মা, নিচের দিকে তাকাও তো। আর ওমনি পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতো। একবারের জন্যও পেছনে তাকাতো না। আহ! আহ!!।[৭৮]

জাহেলী যুগের মানুষ কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করতো। তারা কত পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী ছিল তাই না? আমার আপনার যুগের মানুষ জাহেলী যুগের মানুষের চেয়ে কম পাষাণ নয়। বরং তারাও তাদের মতো। আমার আপনার যুগের মানুষ শুনতে পেয়েছে হাসপাতালে তার কন্যা সন্তান হয়েছে। রাতের অন্ধকারে, প্রকৃতিতে যখন আঁধার ছেয়ে গেছে তখন মৃদু পায়ে হেঁটে আলগোছে পলিথিনের ভেতরে মুড়িয়ে বাচ্চাকে ডাস্টবিনে ফেলে এসেছে। পরে রাস্তার কুকুর যখন ওই শিশুকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করছে তখন মানুষ টের পেয়েছে। বিষয়টা কি আপনার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে? আমরা কোনো আজগুবি কথা বলছি না। আপনি পেপার পত্রিকার পাতায় চোখ রাখুন তাহলে দেখতে পাবেন। দুদিন পরপর এমন খবর আসছে। সাত মাস হয়েছে। এরপর আল্ট্রাসনোগ্রাফী করার পর জানা গেছে মেয়ে বাবু হবে। পেটের ভেতর রেখেই এই শিশুকে মেরে ফেলেছে। প্রিয় ভাই! এই শিশু যদি পরকালে আপনাকে জিজ্ঞেস করে কী অপরাধে তাকে হত্যা করেছেন, আপনি কি তার উত্তর দিতে পারবেন?

﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۞ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾

সেদিন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা শিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।[৭৯]

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।[৮০]

ফেমিকল, পিল খেয়ে কত সন্তান যে বর্তমানে নষ্ট হচ্ছে তা আল্লাহ মালুম। এর সঠিক খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। অনেক মানুষ দরিদ্র্যতার ভয়ে অথবা জায়গা জমিন স্বল্প থাকার দরুণ গর্ভেই সন্তান হত্যা করে! তারা কাবীরা গুনাহ করছে। এটা যে কত জঘন্য পাপ তারা যদি জানতো! মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

দরিদ্র্যতার ভয়ে সন্তান হত্যা করবে না। আমরা তাদের ও তোমাদের জীবিকা দিবো। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ।[৮১]

[৭৮] *ফাতহুল বারী, হা : ৫৯৭৫, ১৩/৪২১-২২*

[৭৯] *সূরা তাকভীর, আয়াত : ৮-৯*

[৮০] *সহীহ বুখারী, হা : ২৪০৮*

[৮১] *সূরা বানী ইসরাইল, আয়াত : ৩১*

আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর বুকে যা কিছু আছে সব আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেকটা সৃষ্টিজীবকে জীবিকা দান করেন আমাদের কি তিনি দেবেন না?

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

পৃথিবীর বুকে যত প্রাণী আছে সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত।[৮২]

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

কত প্রাণী আছে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে না। আল্লাহ তাদের ও তোমাদের জীবিকা দিয়ে থাকেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সবকিছু জানেন।[৮৩]

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا "

তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা'আলার ওপর নির্ভরশীল হও তাহলে পাখিদের যেভাবে রিযিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিযিক দেয়া হবে। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।[৮৪]

এই পৃথিবীতে আপনার যেমন বাঁচার অধিকার আছে ওই শিশুটারও বাঁচার অধিকার আছে। আপনি কেন বলপ্রয়োগ করে তাকে হত্যা করছেন? এই মুখ নিয়ে কি আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে পারবেন? আমি আপনি যখন মায়ের গর্ভে ছিলাম তখনই আমরা পৃথিবীতে কতটুকু রিযিক পাবো তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। সেখানে যে পরিমাণ লেখা আছে তার চেয়ে বিন্দু পরিমাণ কমও পাবেন না আবার বেশিও পাবেন না।

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ بَاعٍ أَوْ ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا.

নবী ﷺ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্র হিসেবে) জমা থাকে। তারপর ওই রকম চল্লিশ দিন রক্তপিণ্ড, তারপর ওই রকম চল্লিশ দিন গোশত পিণ্ডাকারে থাকে। তারপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান এবং তাকে রিযিক, মৃত্যু, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্য- এ চারটি বিষয় লিখার জন্য আদেশ দেয়া হয়। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে যে কেউ অথবা বলেছেন, কোনো ব্যক্তি জাহান্নামীদের আমাল করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র একহাত বা এক গজের তফাৎ থাকে। এমন সময় তাক্বদীর তার ওপর প্রাধান্য লাভ করে আর তখন সে জান্নাতীদের 'আমল করা শুরু করে দেয়। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি জান্নাতীদের 'আমল করতে থাকে। এমন কি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত বা দু'হাত তফাৎ থাকে। এমন সময় তাক্বদীর তার ওপর প্রাধান্য লাভ করে আর অমনি সে জাহান্নামীদের 'আমল শুরু করে দেয়। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।[৮৫]

একটা লোক তিনদিন পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। বিছানায় তার নিথর দেহটা পড়ে ছিল। তিনদিন পর দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ লোকটা বিছানা থেকে উঠে পড়ে। তারপর বাহিরে গিয়ে তিন চক্কর পায়চারি করে ঘরে প্রবেশ করে। টেবিলের ওপর রাখা জগ থেকে এক গ্লাস পানি পান করে ধপাস করে বিছানায় পড়ে। আর ওই মুহূর্তে সাথে সাথে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনা থেকে আপনি কী বুঝতে পারলেন? মানে এখনো তার পৃথিবীতে তিন চক্কর পায়চারির বাকি ছিল ও এক গ্লাস পানি পান করার বাকি ছিল। তার এক গ্লাস পানি রিযিক বাকি ছিল বিধায় তার মৃত্যু হয়নি। আপনার জন্য যে রিযিক বরাদ্দ আছে তা না খেয়ে আপনারও মৃত্যু হবে না।

এক প্রতিবন্ধীকে দেখেছি তিনতলা বিল্ডিং-এর মালিক। আশ্চর্যর বিষয়! সে কীভাবে তিনতলার মালিক হলো! তার ভাগ্যে তার রিযিকে আছে তাই সে এর মালিক হয়েছে। তাই রিযিক নিয়ে কখনো টেনশন করবেন না। আপনি কি শয়তানের কাছে পরাভূত হবেন? তাহলে কোনো অবস্থাতেই রিযিকের চিন্তায় জাহেলী যুগের মানুষের ন্যায় কন্যা সন্তান হত্যা করবেন না। ❐❑

[৮২] *সূরা হুদ, আয়াত : ৬*
[৮৩] *সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৬০*
[৮৪] *তিরমিযী, হা : ২৩৪৪*
[৮৫] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৩৩২*

নারীদের সিয়াম ও যুগের বাস্তবতা

মাযহারুল ইসলাম *

প্রারম্ভিকতা :

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম। সকল দিক ও বিভাগে ইসলাম ভারসাম্য বজায় রেখে মানবতার কল্যাণ সাধন করেছে। ফলে ইসলাম অনুসরণে নারী কিংবা পুরুষ, ছোট কিংবা বড় নির্বিশেষে সকলের সুখ, শান্তি, অফুরন্ত কল্যাণ, সমৃদ্ধি দুনিয়াবী জীবনে যেমন বয়ে নিয়ে আসে ঠিক তেমনিভাবে আখেরাতের জীবন কে নিরাপদ, সুখময় ও রবের প্রিয়ভাজন হতে সহায়তা করে। যেহেতু ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্যই তাই ইসলামে কোনো প্রকার কঠোরতা, সীমালঙ্ঘন কিংবা অপারগতা যা পালন করতে ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা থেকে একেবারেই মুক্ত। ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম দিক হলো এটি। ইসলাম পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্র বিশেষে নানা ধরনের দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করেছে ঠিক তেমনি নারীদের ক্ষেত্রেও শরীয়তের বিভিন্ন ইবাদত, হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে নরমালাইজ (সহজিকরণ) করেছে। ফলে ইসলামের বিধান পালনে নারীদের বিশেষ ছাড় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উপঢৌকন ছাড়া আর কী হতে পারে। ইসলামী শরিয়তে সিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত। যা সামর্থ্যবান পুরুষ এবং নারীর ওপর বাৎসরিকভাবে পরিপূর্ণ এক মাসের আদায়ের প্যাকেজ হিসেবে আগমন করে। অফুরন্ত সওয়াব, রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের সুবর্ণ বার্তার পয়গাম নিয়ে মাহে রমাযান আমাদের দরবারে হাজির হয়। নারী জাতি যেহেতু স্বভাবগতভাবে বিভিন্ন সমস্যায় খুব সহজেই নিপতিত হয় সেক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন মাসআলায় এবং শরীয়ত পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁদের ওপর নির্ধারিত, ইনসাফপূর্ণ, দয়াভিত্তিক। কেননা শারীরিক, মানসিক উভয় দিক থেকেই নারী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। এবং নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত একথাও বলা হয়েছে। শরীয়তের অনান্য বিধানের আলোচনা ব্যতিরেখে নারীদের সিয়াম, ইসলামী বিধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেখানে এমন অনেক বিশেষ মাসআলা আছে যেক্ষেত্রে নারীদের রুখসত (ছাড়, স্বাধীনতা), সহজিকরণের পথ ও পন্থা বিদ্যমান। যা পুরুষের ক্ষেত্রে তেমন বেশি নেই। আজকের প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণে নারীদের সিয়াম ও সিয়াম থাকাবস্থায় নারীদের বিভিন্ন সমস্যার শারঈ পদক্ষেপের বিষয়গুলো আলোচনার প্রচেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

* *শিক্ষক, হোসেনপুর দারুল হুদা সালাফিয়্যাহ মাদ্রাসা, খানসামা, দিনাজপুর।*

❖ **নারীদের সিয়ামের আদব ও সুন্নাতসমূহ :**

১. সাহরী খাওয়া : রোজার জন্য সাহরী খাওয়া ইসলামী শরীয়তে একটি নির্দেশিত সুন্নাহসমূহের মধ্যে অন্যতম সুন্নাহ এবং আদব। সাহাবী আনাস বিন মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : **تسحروا فإن في السحور بركة** তোমরা সাহরী খাও। নিশ্চয় সাহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে।[৮৬]

সাহাবী আমর বিন আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমাদের এবং আহলে কিতাবের (ইহুদি ও খ্রিস্টান) মধ্যে সিয়ামের পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।[৮৭]

২. বিলম্বে সাহরী খাওয়া : সাহাবি যায়েদ বিন সাবেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে সাহরী খেয়েছিলাম। অতঃপর তাঁর সাথে ছালাতে দাঁড়াই। আমি বললাম : আজান এবং সাহরীর মধ্যে কত ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন : ৫০ আয়াত পরিমাণ।[৮৮]

রাসূল ﷺ বলেছেন : **إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه** যখন তোমাদের কেউ আজান শুনবে এমতাবস্থায় পাত্র (খাদ্যর) তাঁর হাতে, সে যেন তাঁর প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাত্র না রাখে।[৮৯]

৩. ইফতার তাড়াতাড়ি করা : ইফতার তাড়াতাড়ি করা বলতে সময়ের আগেই খুবই তাড়াহুড়ো করে কাজ সম্পন্ন করা নয়। বরং সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হওয়ার মুহূর্তে ইফতারের কাজ সম্পন্ন করা। এটা রমাযান মাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। তবে এক্ষেত্রে দুঃখের বিষয় হলো - এই আমল নারীদের মধ্যে অনেকাংশেই অবহেলিত এবং

[৮৬] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯২৩, সহীহ মুসলিম, হা : ১০৯৫*
[৮৭] *সহীহ মুসলিম, হা : ১০৯৬, আবু দাউদ, হা : ২৩৪৩*
[৮৮] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯২১, সহীহ মুসলিম, হা : ১০৯৭*
[৮৯] *আবু দাউদ, হা : ২৩৩৩*

মূল্যায়নহীন। অথচ রাসূল ﷺ হাদিসে বলেছেন: **لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر**

মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তাঁরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে।[৯০]

৪. শুকনা খেজুর অথবা তাজা খেজুর কিংবা পানি দিয়ে ইফতার করা : খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নাত। নবী ﷺ, সাহাবী, তাবে তাবেয়ী সকলেই সাধ্যপর খেজুর দিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করতেন। রাসূল ﷺ-এর আমল থেকে প্রমাণিত এবং প্রসিদ্ধ স্বীকৃত হলো ইফতার খেজুর দিয়ে করা।[৯১]

৫. ইফতারের সময় দোয়া করা : ইফতারের সময় দোয়া করার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে.

ذهب الظمأ وابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله.

(আবু দাউদ ২৩৫৭, আলবানী রহঃ হাদীসটি হাসান বলেছেন)।

৬. দান করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা : রমাযান মাসে বেশি বেশি দান করা হলো রমাযানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। নবী ﷺ রমাযান মাসে মুক্ত বাতাসের মতো দুহাত খুলে দান করতেন। নবী ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল।[৯২]

রমাযান মাসের প্রত্যেক রাতে রাসূল ﷺ এর সাথে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁর কাছে কুরআন পেশ করতেন।[৯৩] যেহেতু কুরআন নাজিল হয়েছে এই রমাযান মাসেই এবং কোরআনের জন্যই রমাযান বিশেষ গুণে গুণান্বিত হয়েছে সেক্ষেত্রে কোরআনের মর্যাদা, সম্মান এবং এর বিশেষ তাৎপর্য্যের প্রমাণ বহন করে।

৭. রমাযানে রোজা থাকা অবস্থায় যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পাপাচার, অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা : রোজার মাসে রোজা থাকা অবস্থায় প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, সকল প্রকার পাপাচার, অবাধ্যতা, গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা সিয়ামের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে একজন মানুষকে মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ ভালো মানুষে পরিণত করার মিশনের নাম হলো সিয়াম। নিছক পানাহার পরিত্যাগ করার শিক্ষা নিয়ে সিয়াম আসে না। বরং প্রভূত কল্যাণ, অসংখ্য শিক্ষা এবং উন্নতি, সমৃদ্ধির প্যাকেজ নিয়ে বছর ঘুরে সিয়াম আমাদের কাছে আগমন করে। সিয়াম থাকা অবস্থায় একজন রোজাদার মিথ্যা, বেহুদা কথা-আলাপচারিতা, অশালীন আচরণ, গিবত, চোগলখোরী, শঠতা, ঝগড়া, মারামারি, প্রবৃত্তির অনুসরণসহ সকল ধরনের অনিষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করে। কোনো রোজাদার ব্যক্তি যদি এগুলোর কোনো একটি কাজের সাথে জড়িত হয় সে ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন :

من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه و شرابه.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করে না তার শুধু খানা-পিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নাই।[৯৪]

❖ **যে সকল জিনিস সিয়ামকে বাতিল করে এবং কাযাকে আবশ্যক করে :**

১. ইচ্ছাকৃতভাবে খাওয়া এবং পান করা : যদি কোনো রোজাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করে কোনো কিছু খায় এবং পান করে তাহলে তার সিয়াম বাতিল হবে এবং সেই সাথে তার ওপর কাযা আদায় আবশ্যক হবে। একই সাথে সে কবিরা গুনাহগার হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অনিচ্ছায় কোনো কিছু ভুলবশত খায় অথবা পান করে তাহলে তার সিয়াম নষ্ট হবে না। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন :

من نسى و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله و سقاه.

যে ব্যক্তি ভুলে আহার করল বা পান করল; সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কারণ, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।[৯৫]

২. ইচ্ছাকৃত বমি করা : যদি হঠাৎ করেই কোনো কারণবশত বমি বের হয় তাহলে সিয়ামের কোনো সমস্যা হবে না। তবে কেউ যদি ইচ্ছা করেই বমি করে তাহলে তার সিয়াম বাতিল হবে এবং সেই সাথে কাযা আদায় করতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন: যে ইচ্ছা করে বমি করে সে যেন কাযা আদায় করে।[৯৬]

৩. হায়েয এবং নেফাস : কোন সিয়াম পালনকারী নারীর যদি হায়েয অথবা নিফাস হয় তাহলে তার সিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে

[৯০] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯৫৭, সহীহ মুসলিম, হা : ১০৯৮*
[৯১] *আবু দাউদ, হা : ১৯৫৫, তিরমিযী- ১১০১*
[৯২] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯০৪, সহীহ মুসলিম, হা : ১১৫১*
[৯৩] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯০৪, সহীহ মুসলিম, হা : ১১৫১*
[৯৪] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯০৩, আবু দাউদ, হা : ২৩৪৫*
[৯৫] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯২৩, সহীহ মুসলিম, হা : ১১৫৫*
[৯৬] *আবু দাউদ, হা : ২৩৮০, তিরমিযী হা : ৭১৬*

যদিও তা দিনের একেবারে শেষ ভাগে হয়। পরে সে এই সিয়ামের কাযা আদায় করবে। সকল ওলামা এটাই মত পেশ করেছেন।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আমরা হায়েয অবস্থায় ছিলাম তিনি আমাদেরকে সিয়ামের কাযা আদায় করার নির্দেশ দেন কিন্তু নামাজের কাযা আদায় করার নির্দেশ দেননি।[৯৭]

৪. ইচ্ছাকৃত ভাবে হস্তমৈথুন করা : অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, স্ত্রী মিলন ছাড়াই প্রবৃত্তির চাহিদায় যে কোনো মাধ্যমে বীর্যপাত করলে তার সিয়াম বাতিল হবে এবং সেই সাথে তার ওপর সিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে।

৫. সিয়াম নষ্টের নিয়ত করা : যদি কোনো সিয়াম পালনকারী স্বজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায় ইচ্ছা পোষণ করে সিয়াম নষ্ট করার তাহলে তার সিয়াম বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও সে খাদ্য, পানীয় পান না করে। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

لكل امرئ ما نوى.

প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।[৯৮]

❖ **<u>সমাজে কিছু প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন :</u>**

১. নাপাকী অবস্থায় সকাল করলে সিয়ামের কোনো সমস্যা হবে কিনা : রমাযান মাসে রাতে স্ত্রী সহবাস, স্বপ্নদোষ কিংবা যে কোনোভাবে নাপাকী অবস্থায় সকাল উপনীত করলে সিয়ামের কোনো সমস্যা হবে না। তাঁর সিয়াম বাতিল, নষ্ট কিংবা পরবর্তীতে পুনরায় সিয়াম রাখা, কাযা আদায় করার কোনো প্রামাণিকতা কুরআন, সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়। বরং নিঃসন্দেহে নাপাকী অবস্থায় সকাল উপনীত করলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। হাদিসে এসেছে, মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত,

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাপাকী অবস্থায় ফজর উপনীত করেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁর পরিবার (স্ত্রী)-এর নিকটে ছিলেন। অতঃপর তিনি গোসল করেন এবং সিয়াম রাখেন।[৯৯]

২. প্রয়োজনের তাগিদে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা যদি সেই স্বাদ পেটে না যায় :

রমাযানে রোজা থাকা অবস্থায় মহিলাদের হরেক রকমের রান্নার আয়োজন করতে হয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের তরকারি রান্না করতে তরকারির স্বাদ অনুভব করতে মারাত্মক বিড়ম্বনার শিকার হয়। এক্ষেত্রে তরকারির স্বাদ অনুভব করতে পারবে কিনা? এটা না জানার দরুণ অনেক রোজা পালনকারী নারী সমস্যার মুখোমুখি হয়। অনেক মহিলা মনে করে রোজা থাকাবস্থায় তরকারির স্বাদ অনুভব করা যাবে না। যদি কেউ করে তাহলে তার রোজা হবে না বলেও সমাজে অনেকের কাছে শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই মাসআলা হলো, যদি প্রয়োজন হয় তরকারির স্বাদ অনুভব করার তাহলে স্বাদ অনুভব করতে পারবে এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো, কোনভাবেই যেন তরকারির স্বাদ পেটে প্রবেশ না করে। যদি পেটে প্রবেশ করে তাহলে রোজা নষ্ট হবে। সাহাবি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, সিয়াম থাকাবস্থায় সিরকা কিংবা কোনো কিছুর স্বাদ অনুভব করাতে কোনো সমস্যা নেই যদি সেটা কণ্ঠনালী অতিক্রম না করে।[১০০]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, প্রয়োজন ছাড়াই খাদ্যের স্বাদ অনুভব করা মাকরুহ। কিন্তু এতে রোজার কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি সেটা প্রয়োজনের কারণে হয় তাহলে সেটা হবে কুলি করার মতো।[১০১]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, স্বাদ অনুভব করার অর্থ হলো - প্রয়োজনে খাদ্যে চিবুনি দেয়া।

বিখ্যাত তাবেয়ী ইউনুস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হাসান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সম্পর্কে বলেন, আমি তাঁকে শিশুর জন্য খাদ্য চিবুনি দিতে দেখেছি অথচ এমতাবস্থায় সে সিয়াম পালনকারী ছিলেন। তিনি খাদ্য চিবুনি দেন অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বের করেন। অতঃপর খাদ্য শিশুটির মুখে দেন।[১০২]

২. সিয়াম পালনকারী প্রচণ্ড পিপাসা কিংবা গরমের কারণে ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালতে পারবে কিনা : অনেক সময় দেখা যায় প্রচণ্ড গরমের কারণে কিংবা পিপাসার কারণে সিয়াম পালনকারী ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালে। অনেকেই মনে করে যে, সিয়াম পালনকারী পিপাসার কারণে অথবা গরমের কারণে সিয়াম থাকাবস্থায় ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালতে পারবে না এতে নাকি রোজার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে! আবার কেউ কেউ বলে, শরীরের লোম দিয়ে নাকি পানি প্রবেশ করে। প্রশ্ন হলো- পিপাসার কারণে হোক কিংবা গরমের কারণে হোক ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালতে পারবে কিনা? এ ব্যাপারে যদি

[৯৭] *সহীহ মুসলিম, হা : ৩৩৫, আবু দাউদ, হা : ২৫৯*
[৯৮] *সহীহ বুখারী, হা : ১*
[৯৯] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯২৬, সহীহ মুসলিম, হা :১১০৯*
[১০০] *ইবনে আবি শায়বা, -৩/৪৭*
[১০১] *মাজমুউল ফতওয়া, ২৫/২৬৬*
[১০২] *মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হা : ৭৫১২*

আমরা নবী ﷺ এর সাহাবীদের দিকে তাকাই তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সাহাবীগন বলছেন যে, আমরা রাসূল ﷺ কে দেখেছি, তিনি রোজা থাকাবস্থায় প্রচন্ড পিপাসা অথবা গরমের কারণে মাথায় পানি ঢালেন।[১০৩]

৩. রোজা থাকাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে চুম্বন করতে পারবে কিনা : যদি কোনো দম্পতি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কোনো প্রকার বীর্যপাত ছাড়াই শুধুমাত্র পরস্পার পরস্পরকে চুম্বন করে তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই যদিও তাঁরা রোজা অবস্থায় থাকে। মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রোজা থাকাবস্থায় তাঁর স্ত্রীকে চুম্বন করেন। আর তিনি ছিলেন নিজেকে সবচেয়ে নিয়ন্ত্রণকারী।[১০৪]

মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা আরো পরিষ্কার করে বলেন : নবী ﷺ আমাকে চুম্বন করেন এমতাবস্থায় তিনি ও আমি উভয়ে রোজা পালনকারী ছিলাম।[১০৫]

৪. রোজা থাকাবস্থায় ব্রাশ করা যাবে কিনা : রোজা থাকাবস্থায় ব্রাশ করা যাবে কিনা এ বিষয়ে অনেক রোজাদার বিড়ম্বনায় পড়েন। কেউ বলে করা যাবে আর কেউ বলে করা যাবে না। আসলে সঠিক কথা হলো- যদি খাদ্যনালীতে প্রবেশ না করে তাহলে ব্রাশ করা যাবে আর যদি প্রবেশ করে তাহলে ব্রাশ করা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে দিনের বেলা ব্রাশ করা থেকে বিরত থাকাই সর্বোত্তম। তবে ব্রাশ করা জায়েজ। এতে সমস্যা নেই। শুধু সচেতন থাকতে হবে যেন খাদ্য কণ্ঠনালী অতিক্রম না করে।[১০৬]

❖ **বৃদ্ধা মহিলা অথবা এমন অসুস্থ যার সুস্থতার কোনো আশা করা যায় না :** এমন বৃদ্ধা মহিলা অথবা এমন অসুস্থ যার সুস্থতার কোনো আশা করা যায় না তার সিয়াম না রাখা এবং তার কাযাও আদায় করতে হবে না বলে জায়েযের ব্যাপারে বিদ্বানগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। জমহুর বিদ্বানদের মতে বিশুদ্ধ কথা হলো - এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দিন দুইজন করে মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে।[১০৭]

❖ **গর্ভবতী মহিলা ও দুগ্ধদানকারিণী রোজা রাখতে পারবে কিনা :** যদি গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধদানকারিণী সিয়াম থাকার কারণে তার পেটের সন্তানের (ভ্রুণ) ক্ষতির আশংকা অথবা সিয়াম থাকার কারণে সন্তান দুধ কম পাবে অথবা সিয়াম থাকার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যাবে বলে মনে করে তাহলে শরীয়তে তাদের সিয়াম না রাখার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছে। নবী ﷺ বলেছেন :

إن الله عز وجل وضع عن المسافر و الحامل و المرضع الصوم

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুসাফির, গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলা থেকে রোজা ভারমুক্ত করেছেন।[১০৮]

যদিও এই মতের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতানৈক্য রয়েছে। তবে সব মতের মধ্যে গ্রহণযোগ্য মত হলো - গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী মহিলা প্রত্যেক দিনের সিয়ামের বদলে মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে। পরবর্তীতে কোনো কাযা আদায় করতে হবে না।[১০৯]

❖ **হায়েয এবং নিফাসের কারণে সিয়াম রাখতে পারবে কিনা :**

ইসলামী শরীয়তে ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নারীদের অনেক ছাড়, সহজিকরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক নারী প্রতি মাসেই স্বভাবগতভাবেই ছাড় পেয়ে থাকে বিশেষ সমস্যার কারণে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য বিশেষ নেয়ামত। তন্মধ্যে হায়েয এবং নিফাস অন্যতম। সকল বিদ্বানের ঐকমত্যে হায়েয এবং নিফাস অবস্থায় নারীদের সিয়াম রাখা বিশুদ্ধ নয়। এমতাবস্থায় তাদের ওপর সিয়াম ফরজ নয়। বরং সিয়াম রাখাই হারাম। তবে যেহেতু এই অবস্থায় সিয়াম রাখতে পারেনি তাই পরের রমাযান মাস আসার আগেই তাকে এর কাযা আদায় করে নিতে হবে। কেননা হায়েয এবং নিফাস হলো নারীদের জন্য দ্বীনের অপূর্ণতা (কমতি)।[১১০]

মা আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হায়েয অবস্থায় ছিলাম, তিনি আমাদের নির্দেশ দেন আমরা যেন সিয়াম না রাখি (পরে কাযা আদায় করবে) এবং তিনি সালাত কাযা করার আদেশ করেননি।[১১১]

❖ **যদি কোনো নারী ঔষধ সেবন করে হায়েয বন্ধ করে রমাযান মাসে তাহলে কি সিয়াম পালনে কোনো নিষেধাজ্ঞা**

---

[১০৩] *আবু দাউদ, হা : ২৩৪৮*
[১০৪] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯২৭, সহীহ মুসলিম, হা : ১১০৬*
[১০৫] *আবু দাউদ, হা : ২৩৮৪*
[১০৬] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১ ম খণ্ড -১১৭ পৃষ্ঠা*
[১০৭] *আল মুগনী -৩/৭৯*
[১০৮] *মুসনাদে আহমাদ-৪/৩৪৭*
[১০৯] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, ১২৭ পৃ.*
[১১০] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯৫১*
[১১১] *সহীহ মুসলিম, হা : ৩৩৫, আবু দাউদ, হা : ২৫৯*

আছে : হায়েয হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীদের জন্য নির্ধারিত বিষয়। রাসূল ﷺ এর যুগে এমন কোনো নারী খুঁজে পাওয়া যায়নি যে নারী সিয়ামকে পরিপূর্ণ এক মাস পালনের জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কেননা এটার দায়িত্ব আল্লাহ দেননি বরং এটি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নারীদের জন্য লিপিবদ্ধ বিষয়। তবে হ্যাঁ! যদি কেউ কোনো ঔষধ সেবন করে আর সেটার দ্বারা কোনো ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে এবং সেই ঔষধ সেবন করার মাধ্যমে রক্ত ও বন্ধ হয় তাহলে সেই ঔষধ সেবন করাতে কোনো সমস্যা নেই। রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেই সে পবিত্র বলে গণ্য হবে।[১১২]

❖ কোনো নারীর ইফতারের কয়েক মিনিট পূর্বে হায়েয শুরু হলে সে কি রোজা নষ্ট করবে নাকি রোজা পূর্ণ করবে?

এই মাসআলার ক্ষেত্রে করণীয় হলো যে, যদি কোনো সিয়াম পালনকারী নারীর ইফতারের কিছু সময় পূর্বে হায়েয শুরু হয় তাহলে সেই নারীর ক্ষেত্রে সিয়াম পূর্ণ না করে সিয়াম নষ্ট করার শরীয়তের নির্দেশ। যদি সেই নারী সিয়ামকে চলমান তথা পূর্ণ করে তাহলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে না। বরং তার ওপর ওয়াজিব হলো সিয়ামকে নষ্ট (ছেড়ে দেয়া) করা (হায়েয ও নিফাসের বিধান সংক্রান্ত ৯০টি ফতওয়া, ইবনে উছাইমিন রহমাহুল্লাহি)।

❖ যদি এমন কোনো নারীর যার স্বাভাবিকভাবে নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মাসেই ১০ দিন হায়েয হয়ে থাকে কিন্তু রমাযান মাসে তার স্বভাবগতভাবে ১৪ দিন হায়েয হয় ফলে সে পবিত্রতা অর্জন করেনি এবং তার লজ্জাস্থান থেকে কালো অথবা হলুদ রঙের রক্ত বের হয় এমতাবস্থায় সে ১৮ দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। ফলে ১৮ দিন থেকে রোজা, নামাজ আদায় করলে তাঁর পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ হবে কিনা : যদি কোনো নারীর স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক মাসের অভ্যাস বেশি দিন হায়েযের রক্ত নির্গত হয় আর সেটা যদি সত্যি হায়েযের রক্ত হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে রোজা এবং নামাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। আর যদি সেই রক্ত হায়েযের না হয় এবং দেখে হায়েযের রক্ত বলেও চিহ্নিত করা না যায় তাহলে সেটা ঐ নারীর ইস্তেহাযা (এক প্রকার রোগ) বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে ঐ নারীর পক্ষ থেকে রোজা, নামাজ থেকে বিরত থাকা যাবে না বরং সে নামাজ, রোজা চলমান রাখবে। শুধুমাত্র বিরত থাকবে অভ্যাসগতভাবে প্রত্যেক মাসের নির্ধারিত হায়েযের দিনগুলোর পরিমাণ অনুসারে।

এরকম নারীর ক্ষেত্রে সে পবিত্র হয়ে সিয়াম চলমান রাখবে অতঃপর যদি সে অচেনা এমন রক্ত দেখে যা হায়েযের রক্তের মতো না বরং সেই রক্ত হলো হলুদ অথবা পাতলা রক্ত অথবা কখনও কখনও কালো তাহলে সেক্ষেত্রে সেই রক্ত হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে না বরং সেক্ষেত্রে তাঁর রোজা এবং নামাজ আদায় বিশুদ্ধ হবে।[১১৩]

উপসংহার :

সিয়াম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পাপ মাফের বিশেষ অনুগ্রহ, রহমত স্বরূপ। যাবতীয় পাপের পথে, মত, চিন্তার জট ছিন্ন করে একমাত্র মহান রবের পানে আগুয়ান হওয়ার একমাত্র মোক্ষম সময় হলো মাহে রমাযান। অদৃশ্য আওয়াজে পাপিষ্ঠ বান্দাকে লক্ষ্য করে বলা হয় 'হে কল্যাণের যাত্রী, এগিয়ে চলো সামনের পথে। হে অকল্যাণের পথ যাত্রী! বন্ধ করো তোমার সব পাপের পথ'। যেহেতু এই রমাযান আসেই বান্দার গুনাহকে মোচন করার জন্য তাই পাপের নিষিদ্ধ পথকে না বলে কেবলমাত্র মহান আল্লাহর প্রিয়ভাযন হওয়ার এমন সুযোগ বান্দার জন্য আর কোনো কিছু কি হতে পারে? রমাযান আসে ইবাদত সমাহার নিয়ে। এত ইবাদতের সমাহার অন্য কোনো সময় বান্দাকে হাতছানি দেয় না। এত সকল ইবাদত যার প্রত্যেকটি জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেয়। কী নারী আর কী পুরুষ, সকলকে এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে পারস্পরিক সহমর্মিতা, ত্যাগ আর পরম করুণাময়ের অফুরন্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে একটি অবিচ্ছেদ্য শরীরের বহিঃপ্রকাশের অন্যতম বাস্তবভিত্তিক বিধানের নাম সিয়াম। সিয়াম পুরুষের জন্য যেমন ফরজ ঠিক তেমনিভাবে নারীর ওপরও ফরজ। তবে ক্ষেত্র বিশেষে নারীদের ওপর সিয়ামের হালকাকরণ করা হয়েছে। শরীয়ত পালনে নারী পুরুষের ওপর মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান সকলের জন্য কল্যাণ, সমৃদ্ধি, উন্নতি নিহিত আছে বলেই আল্লাহ ন্যায়সঙ্গতভাবেই শরীয়তের বিধান প্রণয়ন করেছেন। তাই শরীয়ত পালনে নারীদের সিয়াম যেহেতু খুবই তাৎপর্যময় এবং বিশেষ সুবিধা বিদ্যমান। সেই ক্ষেত্রে সিয়ামের যথাযথ হক আদায় করে সিয়ামকে একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পেশ করাই হলো এর মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য।❐❑

---

[১১২] *সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৮ , হায়েয ও নিফাসের বিধান সংক্রান্ত ৯০ টি ফতওয়া , ইবনে উছাইমিন (রহঃ)*

[১১৩] *হায়েয ও নিফাসের বিধান সংক্রান্ত ৯০ টি ফতওয়া, ইবনে উছাইমিন (রহঃ)*

শুব্বান পাতা

صفحةالشبان

ভালোবাসার রমাযান : ফিরে এলো তাক্বওয়ার মাস

আব্দুল্লাহ আল আসিফ*

প্রারম্ভিকতা :

الحمد لله الذي من على عباده من النعم و فرض علينا في رمضان الصيام وسن لنا القيام وصلى الله تعالى على نبينا وسلم أما بعد...

রাত শেষে ফিরে আসা ভোরের মতো প্রতীক্ষার প্রহর শেষে ফিরে এলো মাহে রমাযান। সর্বত্র বিরাজ করছে অন্যরকম ভালোলাগা। মুমিন হৃদয়ে বইতে শুরু করেছে বসন্তের হাওয়া। কারণ রমাযান মানে - এগারো মাসের অবাধ্যতার ইতিহাস মুছে ফেলে শুদ্ধতার সবুজ পথে নতুন উদ্যমে চলতে শেখা। রমাযান মানে কালো থেকে ভালোর দিকে প্রত্যাবর্তন। রমাযান মানে গাফফারের রহমে সিক্ত হওয়ার আরেকটি সুযোগ। নাজাতের সুগম পথ ও গুনাহ মাফের মোক্ষম সময় এই রমাযান মাস। এ মাসের আগমনে খুলে যাবে আসমানের বন্ধ দুয়ার। উন্মুক্ত হবে দয়াময়ের রহমের দরজা। খুলে দেওয়া হবে জান্নাতের কপাটসমূহ। মাসব্যাপী বন্ধ থাকবে জাহান্নামের দ্বার। রবের শিকলে বন্দি থাকবে বিতাড়িত শয়তান। প্রিয় নাবীর অমিয় বাণী জানান দেয় :

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

যখন রমাযানের প্রথম রজনি আগমন করে, তখন শয়তান ও অবাধ্য জিনগুলোকে কৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। জাহান্নামের দুয়ার সমূহ বন্ধ করা হয় এমনকি কোনো দরজাই আর খোলা হয় না। এবং জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দেওয়া হয় এমন কি কোনো দরজাই আর বন্ধ রাখা হয় না। আর একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকে: হে কল্যানকামী! অগ্রসর হও, হে অকল্যানকামী! পিছু হটো। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্তি দেন। আর এটা প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে।[১১৪]

তাছাড়া এই মহিমান্বিত মাসেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ন হয়েছিল মহা বিশ্বের মহা বিস্ময় আল কুরআনের শাশ্বত বাণী। হেরা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে যার দ্যুতি ছড়িয়েছে তামাম দুনিয়ার বিশ্বাসী অন্তরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾

রমাযান মাস, এতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াতেন জন্য এবং হিদায়াতের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে।[১১৫]

শাবানের শেষ চাঁদ অস্তাচলে পা বাড়ালে সবার মাঝে পরিলক্ষিত হয় টান টান প্রস্তুতি। নতুন চাঁদ দেখার নিমিত্তে পাড়াগাঁয়ের শিশু কিশোরদের মাঝেও তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

প্রিয় পাঠক! তাকওয়ার মহিমায় উদ্ভাসিত হতে এবারের রমাযানকে ঘিরে আপনিও তৈরি করুন বিশেষ পরিকল্পনা।

রমদানের সাধনা :

১. সিয়াম : সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একজন ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলার ভয়ে পানাহার, যৌন সম্ভোগ ও জাগতিক যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকার মাঝেই ফুটে ওঠে তাকওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সিয়াম ইসলামের অন্যতম একটি রোকন এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। রমাযানের সিয়ামকে মুসলিমদের জন্য আবশ্যক করে রব্বুল আলামীন বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

* সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদিস, মাদরাসা মুহাম্মদীয়া আরাবিয়া জেলা শাখা

[১১৪] তিরমিযী, হা : ৬৮২

[১১৫] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫

হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পারো।[১১৬]

অধিকন্তু রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রমাযানের সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১১৭]

সুতরাং মহান রবের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে সিয়াম সাধনায় ব্রতী হন।

২. শুধু তারই ইবাদত : আল্লাহর একত্ববাদে অবিচল থাকুন। তাতে শিরকের আঁচড় লাগাবেন না। এক আল্লাহর জন্য নিবেদিত হোন। ইবাদতের কোনো অংশ যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে না হয়, এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখুন। খ্যাতির লোভ ও লৌকিকতা পরিহার করে তার নির্দেশিত পন্থায় ইবাদতের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করুন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾

কাজেই আল্লাহর ইবাদাত করুন তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে।[১১৮]

৩. কুরআনের সাথে সখ্য : কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নবান হোন। কোরআনের সাথে সখ্য গড়ুন। যেহেতু এ মাসে নাযিল হয়েছে আল-কুরআনের ঐশী বাণী। আর নাবী মোস্তফা ﷺ বলেছেন,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীর জন্য সে শাফা'আতকারী হিসেবে আসবে।[১১৯]

৪. ত্যাগের মহিমা : ক্ষুধার পরই খাবার অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। পিপাসার পরই পানির মিষ্টতা অনুভূত হয়। প্রশান্তির ঘুম হয় পরিশ্রমের পর। আর প্রকৃত সফলতা অর্জিত হয় ত্যাগের বিনিময়ে। ত্যাগের জন্যই রমাযান। তাই সবসময় অন্যকে প্রাধান্য দিন। সবকিছু নিজের জন্য সাব্যস্ত করবেন না। আপনার ধন-সম্পদ, খাবার-দাবার সর্বত্র আল্লাহর রাহে মানুষের জন্য বিলিয়ে দিন। ইফতার করান রোজাদারকে। সে ধনী হোক বা দরিদ্র। পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করুন। নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ .

যে ব্যক্তি কোনো রোযা পালনকারীকে ইফতার করায় তার জন্যও রোযা পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।[১২০]

৫. সাদাক্বাহ : রমাযান উপলক্ষে আপনার দানের হাত প্রশস্ত করুন। সময়ের মর্যাদা গুনে রমাযান মাসে দানের অন্যান্য মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য এই মাসে আল্লাহর হাবিব ﷺ সবচেয়ে বেশি দান করতেন।

৬. মুচকি হাসি : জাদুকরি মুচকি হাসি ভালোবাসার বায়না। সখ্যতার আগামপত্র। মুসলিম ভাইয়ের সাথে মৃদু হেসে কথা বলার অভ্যাস করুন। দ্বিধাবোধ করবেন না। কারণ,

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.

তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ।[১২১]

তবে এই হাসি হওয়া চাই মন থেকে। হওয়া চাই স্বচ্ছ ও পবিত্র।

৭. সুসম্পর্কের সাঁকো : আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখুন। যারা সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাথে হৃদ্যতা গড়ুন। সুসম্পর্কের সাঁকোটা দীর্ঘ করুন। মজবুত করুন পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধন। সতর্ক থাকুন যাতে আপনার দ্বারা অন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ.

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[১২২]

৮. ক্ষমার মাহাত্ম্য : মানুষের প্রতি উদার হোন। যারা আপনাকে কষ্ট দেয়, আপনার অকল্যাণ চায় এই রমাযানের চোখ বন্ধ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তাদের ভুলভ্রান্তিগুলো দাফন করে দিন। তাদের দেওয়া কষ্টগুলো ভুলে যান। মানুষকে ক্ষমা করুন দয়াময়ের ক্ষমার অধিকারী হবেন।

---

[১১৬] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৩*
[১১৭] *সহীহ বুখারী, হা : ১৯০১*
[১১৮] *সূরা আয-যুমার, আয়াত : ২*
[১১৯] *সহীহ মুসলিম, হা : ১৭৫৯*
[১২০] *তিরমিযী, হা : ৮০৭*
[১২১] *তিরমিযী, হা : ১৯৫৬*
[১২২] *সহীহ বুখারী, হা : ৫৯৮৪*

৯. অবসর : অবসরের কাছে হেরে যাবেন না। নেক আমলে পূর্ণ করুন আপনার অবসর। অযথা আড্ডাবাজি, গীবত, পরচর্চায় না জড়িয়ে বই পড়ুন। আল্লাহর যিকিরে আর্দ্র রাখুন জিহ্বা। তাসবীহ তাহলিলে কাটুক আপনার প্রতিটি সময়। ছোট ছোট আমলগুলোকে গুরুত্ব দিন। নফল আমলে এগিয়ে যান আরো একধাপ। অণুক্ষণ আপনার জবানে উচ্চারিত হোক সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি .....।

১০. কিয়ামুল লাইল : নিঝুম রজনীতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সমস্ত বিশ্বচরাচর। নিঃশব্দের ঢেউ খেলে যায় প্রকৃতির বুকে। নীরবতার ছায়া নেমে আসে পৃথিবীর আঙিনায়। এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতেন বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ আলাপ জুড়তেন রবের সাথে। দাঁড়াতেন রাতের মুসল্লায়। দীর্ঘক্ষণ কিয়ামের ফলে পা দুটো ফুলে যেত। তিনি বলেন,

وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ.

ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত।[১২৩]

আর তিনি রমাযানের ব্যাপারে বলেছেন আরো একটি চমৎকার কথা,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

যে ব্যক্তি রমাযানের রাতে ঈমানসহ পুণ্যের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১২৪]

তাই আপনিও শামিল হন রাতের সালাতে। আবেগে অনুরাগে সিক্ত করুন আঁখিদ্বয়।

নিষিদ্ধ সীমারেখা : বাড়াবো না পা

পবিত্র রমাযানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে একজন মুমিনের আল-কুরআন ও সহিহ সুন্নাহয় বর্ণিত, সকল গর্হিত কর্মকাণ্ড ও আচার আচরণ থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং -

❁ এই মহিমান্বিত মাসে কোনো প্রকার পাপাচার-পঙ্কিলতার পথে ধাবিত হবেন না।

❁ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না।

❁ হাত, পা, মুখ ও অন্তরকে পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে সচেষ্ট হোন।

❁ পরনিন্দা ও গীবত থেকে যথাসম্ভব বেঁচে থাকুন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।[১২৫]

আর একজন মুমিনের জন্য নিজের জবানকে হেফাজত করা অতীব জরুরি।

❁ অশ্লীল অনুষ্ঠান, সিনেমা, ম্যাগাজিন, বই ও ওয়েবসাইট ব্রাউজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

❁ ইফতার ও সাহরিতে খাবার বিনষ্ট ও অপচয় রোধ করুন।

❁ সালাত ও অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা ঝেড়ে ফেলুন।

❁ ঠকবাজি, প্রতারণা, খেয়ানত, ঝগড়া-বিবাদ ও গালিগালাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন।

❁ মিথ্যা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করুন। কারণ মিথ্যা কুফরের মূল বুনিয়াদ। মুনাফিকের সদর দ্বার। মিথ্যাকে ছোট করে দেখবেন না, প্রশ্রয় দিবেন না। সেটা ইচ্ছে করে হোক বা ঠাট্টার ছলে। বিশ্বনবীর ফরমান বলে,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।[১২৬]

সর্বোপরি এই রমাযানে তাকওয়ার মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে বিশ্বাসী চেতনা ও শুদ্ধাচারী প্রেরণায় উজ্জীবিত হোক প্রতিটি হৃদয়। আবার ফিরে আসুক পঙ্কিলতাহীন পবিত্রতার আবেশ জড়ানো অনাবিল স্নিগ্ধতার জোয়ার। আমলের দিনগুলো ফুরিয়ে যাবার আগেই ঝরে যাক কদর্যতার রেশ। সবশেষে রবের কাছে এই প্রত্যাশা। মালিক ! কবুল করে নিও.....। ❐❑

[১২৩] *সহীহ মুসলিম, হা : ২৬৪৫*
[১২৪] *সহীহ বুখারী, হা : ৩৭*
[১২৫] *সূরা হুমাযাহ, আয়াত : ১*
[১২৬] *সহীহ বুখারী, আয়াত : ১৯০৩*

দাওয়াত ও তাবলীগ

শাহাদাত হোসেন সামি *

প্রারম্ভিকতা :

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين و خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله ورسوله الهادي الأمين وعلى آله وصحبه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :

ভূমিকা : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে।[১২৭]

মানব জাতি সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও যখন স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টির উপাসনা শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট জাতির হিদায়াতের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে যুগে যুগে অসংখ্য নাবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। শুধু দাওয়াত ও তাবলীগ-এর কাজ করার জন্য। যেমন : আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো আর ত্বাগুত বা শয়তান থেকে দূরে থাকো।[১২৮]

দাওয়াত শব্দটি আরবী, এর মূলধাতু হচেছ دعو। যার শাব্দিক অর্থ আহবান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। যারা আহবান করে তাদেরকে দা'ঈ বা দাওয়াতদাতা বলা হয়।

তাবলীগ শব্দটিও আরবী, এর মূল ধাতু হচ্ছে بلغ। যার শাব্দিক অর্থ ভালভাবে পৌঁছে দেয়া বা প্রচার করা, যিনি পৌঁছে দেন তাকে মুবাল্লিগ বলা হয়।

আর আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার অর্থ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব শেষ অহীর পথে আহবান করা। যার মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস। অতএব নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র অহীভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে দাওয়াতই মানুষকে সঠিক হিদায়াত ও মুক্তির পথ দেখাতে পারে। আর এ দাওয়াত ও তাবলীগের সর্বপ্রথম দায়িত্ব পালন করেছেন আল্লাহর প্রেরিত নাবী ও রাসূলগণ। আর তাদের মৃত্যুর পরবর্তীতে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আলেম সমাজের প্রতি।

দাওয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সকল কাজেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.

অর্থ : আমি মানুষ ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমারই ইবাদতের জন্য।[১২৯]

অনুরূপভাবে আল্লাহর পথে দাওয়াত ও তাবলীগ করার পেছনে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা :

১. মানুষকে অন্ধকার ও গুমরাহী থেকে হিদায়াত ও আলোর পথে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান।[১৩০]

২. মানুষের আক্বীদাহ ও আমল সহীহ এবং বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا .

অর্থ : আমরা তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করে দিবো।[১৩১]

---

* এম. এম. আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

[১২৭] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৪

[১২৮] সূরা আন-নাহাল, আয়াত : ৩৬

[১২৯] সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬

[১৩০] সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৫৭

৩. মানুষদেরকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে ফিরেয়ে নিয়ে যাওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

অর্থ : হে মুমিনগণ। তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[১৩২]

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার নিয়ম ও পদ্ধতি :

১. হিকমাত অবলম্বন করা : দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য সবচেয়ে যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজন তা'হল, হিকমাত ও কৌশল অবলম্বন করে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে মানুষকে দাওয়াত দেয়া। যাতে মানুষ সহজে দাওয়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

অর্থাৎ আপনি মানুষকে দাওয়াত দিন আপনার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা।[১৩৩]

২. নম্রতার সাথে কথা বলা : দাওয়াতী ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কৌশল হলো মানুষের সাথে নরম ও কোমল মন নিয়ে কথা বলা। এতে করে সহজেই মানুষের অন্তরে পরিবর্তন দেখা দেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

অর্থ : আপনি আল্লাহর দয়ায় তাদের প্রতি কোমল হৃদয়বান হয়েছিলেন। যদি আপনি তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়তো।[১৩৪]

৩. উত্তম পন্থায় প্রশ্নের জওয়াব দেয়া : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

অর্থ : আপনি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করুন। তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু।[১৩৫]

৪. কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াতী কার্যক্রম চালানো : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

অর্থ : আমি তো আমার প্রতি যা অহী অবতীর্ণ হয় তারই অনুসরণ করি। বস্তুত আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে আমি কিয়ামতের কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি।[১৩৬] রাসূল ﷺ বলেছেন,

﴿تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ﴾

অর্থ : আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ধরে রাখবে তোমাদের কেউ পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু'টি বস্তু হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার রাসুলের সুন্নাত।[১৩৭]

৫. সর্বদা দাওয়াতের কার্যক্রম চালু রাখা : দাওয়াত দেয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। দিন-রাত প্রতিটি মুহূর্তে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সুখে-দুঃখে সর্ব অবস্থায় দাওয়াতের ধারাবাহিকতা মানুষের মাঝে চালিয়ে যেতে হবে। যেমন : নূহ ﷺ-এর দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾

[১৩১] *সূরা আল-ফুরকান, আয়াত : ২৩*
[১৩২] *সূরা তাহরীম, আয়াত : ৬*
[১৩৩] *সূরা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫*
[১৩৪] *সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯*
[১৩৫] *সূরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত : ৩৪*
[১৩৬] *সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৫*
[১৩৭] *মুয়াত্তা মালেক হা : ১৫৯৪*

অর্থ : নূহ (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহবান করেছি, আর ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে, চুপিসারেও দাওয়াত দিয়েছি।[১৩৮]

৬. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ক্রমান্বয়ে পেশ করা : মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, তখন তাঁকে তাদের মাঝে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন :

إِنَّكَ تَقْدَمُ على قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذلكَ فَأَخْبِرْهُمُ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيهِم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيهِم زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ .

অর্থ : তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে তাদেরকে প্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিবে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল ও তার বান্দা। তারা যখন এটা মেনে নেবে তখন তুমি তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দাওয়াত দিবে, আর তারা যখন এটা মেনে নিবে তখন তুমি তাদেরকে যাকাত প্রদান করার দাওয়াত দিবে।[১৩৯]

দাওয়াত দাতার চরিত্র ও গুণাবলী : দাওয়াত ও তাবলীগি কাজের মুখ্য ভূমিকা যারা পালন করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে যেসব ব্যক্তিগত গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১. ইখলাস ও বিশুদ্ধ নিয়্যাত : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.

অর্থ : তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তারই জন্য দীনের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে।[১৪০]

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

أخلِصْ دِينَك يَكْفِك القليلُ مِن العمَلِ.

অর্থ : তুমি তোমার দীনকে একনিষ্ঠভাবে পালন কর, তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[১৪১]

২. জ্ঞান অর্জন করা : দাওয়াত ও তাবলীগ করার পূর্বে কুরআন ও হাদীসের সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুবাল্লিগের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾

অর্থ : আপনি জেনে রাখুন! আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নেই।[১৪২]

৩. ধৈর্যশীল হওয়া : দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্যধারণ করা প্রত্যেক দা'ঈর জন্য অতীব জরুরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾.

অর্থ : তাদের সবরের কারণে তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে এবং তারা ভাল দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে।[১৪৩]

৪. ইলম অনুযায়ী আমল করা : দাওয়াতদাতা যে বিষয়ের দিকে মানুষকে আহবান করবে উক্ত বিষয়ের ওপর নিজেকে যথাসম্ভব আমল করতে হবে। অন্যথায় তার এ দাওয়াতে কোনো উপকার বয়ে নিয়ে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

অর্থ : হে ইমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন করো না, তোমরা যা করো না তা বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।[১৪৪]

---

[১৩৮] *সূরা আন-নূহ, আয়াত : ৫- ৯*
[১৩৯] *সহীহ বুখারী, হা : ৬৯৩৭*
[১৪০] *সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত : ৫*
[১৪১] *মুসতাদরাকে হাকীম, হা : ৭৮৪৪*
[১৪২] *সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৯*
[১৪৩] *সূরা কাছাছ, আয়াত: ৫৪*
[১৪৪] *সূরা সাফ, আয়াত : ২-৩*

৫. আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা : প্রতিটি ভাল কাজের পূর্বে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা। এটা মু'মিন বান্দার জন্য একান্ত জরুরি। আর কাউকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে প্রথমে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

অর্থ : হে রাসূল! আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তাঁর ওপরই ভরসা করে।[১৪৫]

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য : দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। যেমন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.

অর্থ : হে রাসূল! আপনি তাবলীগ (প্রচার) করুন যা আপনার রবের পক্ষ হতে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে।[১৪৬]

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার হুকুম বা বিধান : দাওয়াতের তিনটি স্তর রয়েছে।

১. ফরযে আইন : যা প্রত্যেক মু'মিন-মুসলিমদের ওপর ফরয। যা ছেড়ে দিলে কঠিন গুনাহগার হবে, যখন সমাজের লোকেরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে, নেকীর কাজ ছেড়ে দেবে।

২. ফরযে কিফায়া : যা কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াতের কাজ করলে বাকীদের জন্য যথেষ্ট হবে। যখন মানুষেরা নেকীর কাজ বেশি করে আর গুনাহের কাজ ছেড়ে দেয়।

৩. দাওয়াতে মুবাহ : দাওয়াত দিলে সওয়াব পাবে, না দিলে গুনাহগার হবে না। যখন সমাজের লোকেরা নেকীর কাজ করতে থাকবে তখন সমাজের ভিতর থেকে কিছু লোক এ দাওয়াতের কাজে সব সময় নিয়োজিত থাকবে, এই অবস্থায় দাওয়াত দেওয়া মুবাহ হয়ে যায়।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার ফযীলত : আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও তাবলীগ করার ফযীলত ও প্রতিদান অফুরন্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[১৪৫] *সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৩৮*
[১৪৬] *সূরা আল-মায়েদা, আয়াত : ৬৭*

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : তার কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কী হতে পারে যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎ আমল করে এবং বলে আমি একজন মুসলিম।[১৪৭]

উপসংহার : আসুন! আমরা সবাই কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করি আর জান্নাত লাভ করি। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে এই তাওফীক দাও। আমীন। ❐❑

রমাযানের সম্ভাষণ

–রিফাত সাঈদ
(অধ্যয়নরত, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, বংশাল, ঢাকা।)

বেজে উঠেছে ঘণ্টা রমাযান আগমনের,
ঈমানি হিয়ার অরণ্যে আশ্বাসের বাতাস বয়ে যাচ্ছে
অবারিত ক্ষমা লাভের।
অবতীর্ণ হলো রমাযানেতে পরম রবের বাণী,
রহমত -বরকত-মাগফিরাত আশ্রিত আছে সবই
মোরা জানি।
রমাযানের পয়গামে জিঞ্জিরাবদ্ধ হয় শয়তান,
তৎক্ষণাৎ পাপক্ষালনের ধোঁয়া উদগীর্ণ হয়-এই যে
ফরমান।
রমাযানের আগমনে অধিষ্ঠান হয় পুণ্যসঞ্চয়ের
বিবস্বান,
অনতিবিলম্বে অনবদ্য এই সুযোগে পরিশুদ্ধ ও মজবুত
করে নাও তোমার ঈমান।
রহমত অভিষিক্ত রমাযানের অভিষেকে করো পরিহার
অপবাদ, গীবত, হিংসা, অহংকার, হারাম কর্ম-কথা,
শিরক্ আর বিদ'আত,
নিষুপ্ত রজনীতে নিবিষ্টচিত্তে তাহাজ্জুদ সমেত নিরন্তর
প্রয়াসে ইবাদাত করে যাও-মিলবে তবেই জান্নাত।
মোদের তরে আসন্ন সেই ঈপ্সিত রমাযান,
'আহলান ওয়া সাহলান'-বলে জানাই তোমাকে সম্ভাষণ।

[১৪৭] *সূরা হা-মীম সাজদা, আয়াত: ৩৩*

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ

মূল : শায়েখ আযহারী আহমাদ মাহমূদ
অনুবাদ : মুহা. মাহফুজুর রহমান বিন আব্দুস সাত্তার *

যাবতীয় প্রশংসা সকল সিফাতে কামালে গুণান্বিত মহামহিম আল্লাহ তা'আলার জন্যে। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সত্যের আহ্বায়ক মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি। তার পরিবার পরিজন ও সাথীবর্গের প্রতি।

পরকথা হলো, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে রহস্যময় বেশকিছু জিনিস সৃষ্টি করেছেন। বিবেক যা জানতে অপারগ, বড় বড় পন্ডিতরাও এক্ষেত্রে হতবুদ্ধ!

এ বই আপনাকে সে রহস্যময় সৃষ্টিগুলোর একটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। আর তা হলো নফস। এ আশ্চর্যজনক সৃষ্টি নফস-ই মানুষকে পরিচালিত করে। সে কখনো কখনো মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করে। আবার কখনো কখনো অন্যায় অকল্যাণের দিকে আহ্বান করে।

নফস হলো এক মূল্যবান রত্ন।

নফস হলো, নিরাপত্তা দরিয়া, গোপন বিষয়ের সংরক্ষণাগার।

নফস হলো বন্ধু বেশে এক শত্রু।

"নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ" গ্রন্থটি লেখকের "মুহাসাবা" শিরোনামে প্রকাশিত ধারাবাহিক সিরিজের অন্যতম অনবদ্য গ্রন্থ এবং নফসের হিসেব নিকেশের সূচনাপথ।

জিহাদ পরিচিতি

আভিধানিক অর্থ : প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা।

পারিভাষিক অর্থ : জিহাদের দুটি অর্থ আছে :

১. আম অর্থ : আর তা হল, আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বিষয় অর্জন ও তার অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্যে চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় করা। এ প্রকার জিহাদ প্রত্যেক মুকাল্লাফ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। আর এ অর্থে কুরআন সুন্নাহয় বেশ কয়েকটি দলীল বর্ণিত, হয়েছে। যেমন :

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'তবে তাঁদের মাঝে জিহাদ করো অর্থাৎ তাঁদের খিদমাতে তোমার প্রচেষ্টা ব্যয় কর।'[১৪৮]

রাসূল ﷺ আরো বলেন,

" اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ "

যে লোক নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে সে-ই আসল মুজাহিদ।[১৪৯]

২. খাস অর্থ : কাফের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। এ প্রকার জিহাদের হুকুম হল ফরজে কিফায়া তবে কখনো কখনো ফরজে আইন হয়ে যায়। আর কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত, জিহাদ সংক্রান্ত প্রায় সবগুলো দলীল এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। [১৫০]

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ কী?

হে দ্বীনী ভাই, আপনি কি জানেন নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ কী?

-তা তো এক প্রকার যুদ্ধ। আপনি যদি তাতে পরাজিত হন তাহলে তো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে দুর্ভোগ।

-তা তো এক প্রকার লড়াই যাতে প্রয়োজন অস্ত্র, পূর্ণপ্রস্তুতি ও পাহাড়সম সাহস।

-তা তো এমন একজনের বিরুদ্ধে জিহাদ; যে আপনার নিজের মাঝেই লুক্কায়িত আছে।

-তা তো এমন এক জিহাদ যা কাফের মুশরিক ও নাস্তিকদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়েও কঠিন।

* *এম. এম. আরাবীয়া। ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[১৪৮] *সহীহ বুখারী, আয়াত : ৩০০৪*
[১৪৯] *সুনান তিরমিযী, হা : ১৬২১*
[১৫০] *অনুবাদক*

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের অর্থ সম্পর্কে ইবনু আল্লান বলেন, "মুজাহাদা (**مجاهدة**) শব্দটি **مفاعلة** ওযনে। **مجاهدة** শব্দটি নির্গত হয়েছে **الجهد** মাসদার থেকে। অর্থ শক্তি, সামর্থ্য। কেননা মানুষ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে ভালো কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে; যে ভালো কাজগুলো ইহকাল ও পরকালে তার উপকার করবে। পক্ষান্তরে নফস যে দিকে ইহা সেদিকে ঝুঁকে যাওয়ার মাধ্যমে তা মানুষের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।"

নফসের বিরুদ্ধে আপনার জিহাদ হলো, আপনি তাকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যমূলক কাজে ব্যবহার করবেন। পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। প্রবৃত্তি অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকবেন।

নফস তিন প্রকার :

১. নফসে আম্মারাহ : যা মন্দ ও পাপ কাজের আদেশ করে। মন্দ চরিত্রের প্রতি উৎসাহিত করে।

২. নফসে লাওআমাহ : যা পাপকাজে পতিত হওয়ার সময় অবশিষ্ট ঈমানের নূরের কারণে ব্যক্তিকে সতর্ক করে এবং পাপ কাজ করে ফেললে নিজেকে ভর্ৎসনা করে।

৩. নফসে মুতমাইন্নাহ : যা ঈমানের নূর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। যার কারণে তা সকল মন্দ কথা কর্ম থেকে বিরত থাকে এবং সুন্দর গুণে গুণান্বিত হয়।

মুসলিম ভাই, আপনি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বাদ দিয়ে কোথায় নিমজ্জিত হয়ে আছেন? আপনি ফরজে আইন জিহাদ ছেড়ে দিয়ে কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন? আপনি কি জানেন না যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে কিফায়া হলেও নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজে আইন? (তারপরও আপনি তা থেকে উদাসীন!) আপনি যদি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ না করেন তবে কিছুতেই তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারবেন না। তাই আপনার দিনের সূচনা যেন হয় তার হিসাবনিকাশ দিয়ে। দোষগুলো চিহ্নিত করার মাঝ দিয়ে।

ভুলগুলো চিহ্নিত করে নতুনোদ্যমে আবার নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করুন। প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকুন। মালিক বিন দীনার বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার ওপর রহম করুন, যে নিজেকে বলে, তুমি কি এরূপ কাজ করোনি? তুমি কি এরূপ মন্দ কাজে জড়িত হওনি? অতঃপর নিজেকে তিরস্কার করে। কিতাব সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে।"

মাইমূন বিন মিহরান বলেন, "ব্যবসায়ী তার অংশীদারের যেরূপ হিসাব নেয়, কোনো ব্যক্তি নফসের সেরূপ হিসাব না নেওয়া পর্যন্ত মুত্তাকি হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোথায় থেকে তার পোষাক, খাদ্য, পানীয় আসে যতক্ষণ না সে হিসাব করবে ততক্ষণ মুত্তাকী হতে পরবে না।"

ওহে ঐ ব্যক্তি, যিনি শত্রু মিত্রকে চিনতে চাচ্ছেন। আপনি কি জানেন যে, আপনার নফস-ই আপনার প্রথম শ্রেণীর একজন শত্রু?

আবূ বাকার রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে খেলাফতের জন্যে মনোনীত করেন তখন তাকে অসিয়ত করে বলেন,

إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فهذا الجهاد يحتاج أيضاً إلى صبر، من صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبه وحصل له النصر والظفر، وملك نفسه، فصار عزيزاً ملكاً، ومن جزع ولم يصبر على مجاهدة ذلك، غلب وقهر وأسر، وصار عبداً ذليلاً أسيراً في يدي شيطانه وهواه.

"নিশ্চয় আমি তোমাকে সর্বপ্রথম সতর্ক করছি তোমার মধ্যস্থিত নফস সম্পর্কে। এ জিহাদেও প্রয়োজন ধৈর্য্যের। যে ব্যক্তি নফস, প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদে ধৈর্য্যধারণ করবে সে বিজয় অর্জন করবে। নিজের নফসের কর্তৃত্ব অর্জন করতো পারবে। এক শক্তিশালী মালিক হতে পারবে। সা.....[১৫১]

ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ বলেন, "মানুষের শত্রু তিনটি। এক. দুনিয়া, দুই. শয়তান, তিন. নিজের নফস। সুতরাং দুনিয়া থেকে সতর্ক থাকো তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।

[১৫১] *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/ ৪৬০-৪৮৯*

শয়তান থেকে সতর্ক থাকো তার বিরোধিতার মাধ্যমে। আর নফস থেকে সতর্ক থাকো প্রবৃত্তির অনুসরণ পরিত্যাগ করার মাধ্যমে।"

মুসলিম ভাই! নফসের ভয়াবহতা সম্পর্কে সালাফগণ এরূপই জেনেছেন। নফস হল সবচে' নিকটবর্তী শত্রু। সুতরাং সকল জিহাদের পূর্বে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। তার অনিষ্ট থেকে সতর্ক থাকুন।

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের কতই না প্রয়োজন যা তার শত্রুতা দূর করে দিবে। ইমাম হাসান বাসরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك.

অর্থাৎ বন্যজন্তু তোমার নফসের চেয়ে অধিক শক্ত বাঁধনের প্রয়োজন অনুভব করে না।

আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ খুব ইবাদত করতেন এবং গ্রীষ্মের দিনে সিয়াম রাখতেন, এমনকি তার শরীর শুকিয়ে একদম ক্ষীণ হয়ে যায়। তখন আলকামাহ ইবন কায়েস তাকে বলেন, আপনি কেন আপনার নফসকে কষ্ট দিচ্ছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি চাই যে, আমার নফস পরকালে অতি সম্মানিত হোক (এ জন্য এ কঠোর পরিশ্রম করছি।)

রাবী 'ইবনু খছআমের মা যখন রাবীকে অনেক কাঁদতে ও রাত্রিজাগরণ করতে দেখলেন তখন তাকে ডাক দিয়ে বলেন, হে আমার বৎস, তুমি কি কাউকে হত্যা করেছ?

রাবী 'বলেন, হ্যাঁ, তিনি বলেন, তুমি কাকে হত্যা করেছ আমাদেরকে বল, আমরা তার পরিবার থেকে মাফ চেয়ে নিব? আল্লাহর কসম তুমি যে পরিমাণ অনুশোচনাবোধ করছ তা যদি তারা জানতে পারে তবে অবশ্যই তারা তোমার ওপর দয়া করে মাফ করে দিবে।

রাবী 'বলেন, আম্মাজান, সে নিহত ব্যক্তি তো আমার নফস!

মুসলিম ভাই! আপনি এ নফসকে ছোট মনে করবেন না। কেননা সে অনেককে চরিত্রহীন করেছে; যে চরিত্র প্রত্যেক ব্যক্তির অমূল্য সম্পদ। এ নফস তার প্রবৃত্তি খাহেশার দিকে আহ্বান করতে থাকে মানুষকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করা পর্যন্ত। যতগুলো প্রবৃত্তি পূজারী ধ্বংস হয়েছে তাদেরকে তাদের নফসের কুমন্ত্রণাই ধ্বংস করেছে।

হে আদমসন্তান, যখন আপনি আপনার সময়গুলো নফসের জন্যে ছেড়ে দিবেন সে যেখানে ইচ্ছে আপনাকে পরিচালিত করবে তখন আপনার সফলতার সম্ভাবনা খুবই কম।

হে বিবেকবান ব্যক্তি, আপনি নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে কী অস্ত্র প্রস্তুত করেছেন?

আপনার উত্তর যেন কিছুতেই এ কথা না হয় যে, তাতো আমারই নফস (তার বিরুদ্ধে জিহাদের জন্যে আবার কি অস্ত্র প্রস্তুত করব!) এ কঠোর যুদ্ধে বিজয়ী হতে চাইলে অবশ্যই আপনার প্রয়োজন রয়েছে জোরালো প্রস্তুতি ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদির। বাস্তবেই নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ এক কঠোর যুদ্ধ। কেননা এ যুদ্ধে আপনি এমন একজনের সাথে লড়াই করবেন যে আপনার নিজের ভিতরেই লুক্কায়িত আছে।

একদল মুজাহিদ যুদ্ধ করে ফিরে এসে ইবরাহীম ইবন আলকামাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদেরকে বলেন,

قد جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكبر؟ قالوا و ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد القلب.

অর্থাৎ "তোমরা ছোট জিহাদ করে আসলে, সুতরাং বড়ো জিহাদের ক্ষেত্রে কী করবে? তারা বলল, বড়ো জিহাদ কী? তিনি বলেন, বড়ো জিহাদ হল, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ।"

হাফেয ইবন রজব হাম্বলী বলেন, "প্রকাশ্য শত্রু কাফেরদের বিরুদ্ধে যেমন জিহাদ করতে হবে অনুরূপভাবে গোপন শত্রু নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে হবে। কেননা নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদই সর্বোত্তম জিহাদ। রাসূল (ﷺ) বলেন,

المجاهد من جاهد نفسه.

অর্থাৎ প্রকৃত মুজাহিদ তো সে, যে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। " *(চলবে ইনশাআল্লাহ)*

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) : *পবিত্র রমাযান মাসের শুরু এবং অন্যান্য বিষয়ে মুসলিম জাতির ঐক্যের স্বার্থে কেউ কেউ সৌদি আরবের সাথে মিলে রমাযান মাস শুরু করার আহ্বান জানায়। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান কী?*

আব্দুল রাকিব, শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তর : খালি চোখে চাঁদ দেখে আমাদেরকে রমাযানের সিয়াম শুরু ও শেষ করতে হবে। এই মর্মে একাধিক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে, সে যেন সিয়াম পালন করে।"[১] যদি ধরে নেয়া হয় যে, পৃথিবীর শেষ প্রান্তের লোকেরা রমাযান মাসের চাঁদ দেখেনি আর মক্কার লোকেরা চাঁদ দেখেছে, তাহলে কিভাবে এই আয়াত দ্বারা তাদেরকে সম্বোধন করা হবে যারা চাঁদ দেখেনি?

আর নবী ﷺ বলেছেন, صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ

'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখো, চাঁদ দেখে রোযা ভঙ্গ করো।"[২] মক্কার অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে তবে পাকিস্তান এবং তার পূর্বের দেশগুলোর এলাকার অধিবাসীদের কিভাবে আমরা বাধ্য করতে পারি যে তারাও সিয়াম পালন করবে? অথচ আমরা জানি যে, তাদের আকাশে চাঁদ দেখা যায়নি। আর নবী ﷺ সিয়ামের বিষয়টি চাঁদ দেখার সাথে শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন।

বুদ্ধিভিত্তিক দলীল হচ্ছে, বিশুদ্ধ কিয়াস যার বিরোধিতা করার অবকাশ নেই। আমরা অবগত আছি যে, পশ্চিম দিকের আগেই পূর্ব দিকে ফজর উদিত হয়। পূর্ব এলাকায় ফজর উদিত হলে কি আমরা পশ্চিম এলাকার দিকে যখন ফজর উদিত হবে তখন কি আমরা পানাহার থেকে বিরত হবো? অথচ আমাদের কাছে এখনো রাত বাকী আছে?

উত্তর: না। সূর্য যখন পূর্ব দিকে অস্তমিত হয়, তখন আমাদের কাছে দিন বাকী থাকে। আমরা কি ইফতার করবো? **উত্তর:** অবশ্যই না। অতএব চাঁদের বিষয়টিও সম্পূর্ণরূপে সূর্যের অনুরূপ। চন্দ্রের হিসাব মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর সূর্যের হিসাব দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেছেন,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

"সিয়ামের রাতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে; তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ। আল্লাহ অবগত আছেন যে, তোমরা নিজেদের খিয়ানত করছিলে। এ জন্যে তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাদের ভার লাঘব করে দিলেন; অতএব এক্ষণে তোমরা রোযার রাতেও তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হতে পারো এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান করতে পারো এবং প্রত্যুষে কালো রেখা হতে ফজরের সাদা রেখা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর; অতঃপর রাত পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতেকাফ করার সময় স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না; এটাই আল্লাহর সীমা, অতএব তোমরা তার নিকটেও যেয়ো না। এভাবে আল্লাহ মানবমণ্ডলীর জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেন, যেন তারা সংযত হয়।"[৩]

আল্লাহই আবার বলেছেন,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

'অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসে উপনীত হবে, সে যেন সিয়াম পালন করে।' সুতরাং যুক্তি ও দলীলের নিরীখে

[১] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৫*

[২] *সহীহ বুখারী, অধ্যায়: সিয়াম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সিয়াম*

[৩] *সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৮৭*

সিয়াম ও ইফতারের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক স্থানের জন্য আলাদা হুকুম নির্ধারণ করবো। এই হুকুমকে বাহ্যিক আলামত বা চিহ্নের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এবং নবী ﷺ তাঁর সুন্নাতে নির্ধারণ করেছেন। আর তা হচ্ছে চাঁদ প্রত্যক্ষ করা এবং সূর্য বা ফজর প্রত্যক্ষ করা।

☞ প্রশ্ন (২) : *রমাযান মাস অতি নিকটে। আমার মুহতারাম পিতা এরই মধ্যে খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। জানি না তিনি এবারের সিয়াম রাখতে পারবেন কি না। তিনি যদি সিয়াম রাখতে না পারেন, তাহলে তার জন্য কুরআন-হাদীসে কী সমাধান রয়েছে? দয়া করে জানাবেন।*

মতিয়ার রহমান, গবিন্দগঞ্জ, গাইবান্দা

উত্তর : আল্লাহ আরো বলেন :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا﴾

"তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর কথা শোনো ও আনুগত্য করো"।[৪]

নবী ﷺ বলেন, إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ "নিশ্চয় দ্বীন অতি সহজ।"[৫]

তিনি আরো বলেন : وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'আমি যখন কোনো বিষয়ে তোমাদেরকে আদেশ করি, তখন সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন করো।'[৬]

উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ওযরবিশিষ্ট লোকদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এবাদতকে তাদের ওযর অনুপাতে সহজ ও হালকা করে দিয়েছেন। যাতে তারা বিনা কষ্টে এবং কোনো প্রকার অসুবিধা ছাড়াই তাঁর এবাদত করতে পারে। আলহামদু লিল্লাহ। অতএব আপনার পিতার পক্ষ হতে প্রতিদিন একজন ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ালেই যথেষ্ট হবে। অতি কষ্ট হলে তার সিয়াম রাখা আবশ্যক নয়।

☞ প্রশ্ন (৩) : *কোনো এক রমাযান মাসে শয়তানের ধোঁকার শিকার হয়ে দিনের বেলায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। বিষয়টি আমাকে খুব পীড়া দিচ্ছে। দয়া করে এ বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।*

শাহীনুল ইসলাম, কয়রা, খুলনা

উত্তর : আপনি রমাযানের পবিত্রতা নষ্ট করে নিজের ওপর যুলুম করেছেন। তাই আপনার ওপর তাওবা করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে ঐদিনের বদলে একটি সিয়াম কাযা করতে হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। নিম্নের হাদীসে এই অপরাধের কাফফারার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ আছে।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা একদা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক লোক এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী ﷺ বললেন : তোমার কী হয়েছে? সে বলল : আমি রোযা অবস্থায় (দিনের বেলা) আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি একটি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? সে বলল : না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল : না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন : তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে পারবে? সে বললঃ না। বর্ণনাকারী বলেন : সে লোকটি নবী ﷺ-এর নিকট (কিছুক্ষণ) অপেক্ষা করল। আমরাও নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় নবী ﷺ-এর নিকট এক ঝুড়িভর্তি খেজুর আনয়ন করা হল। নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল : এই তো আমি। তিনি বললেন : তুমি এগুলো নাও এবং সাদকা করে দাও। তখন লোকটি নবী ﷺ-কে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো কি আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোকদেরকে সাদকা করে দিব? আল্লাহর শপথ, মদীনার দু'টি কংকরময় ভূমির মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অধিক গরীব পরিবার আর নেই। এ কথা শুনে নবী ﷺ হাসলেন। এমনকি তাঁর মুখের সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ বললেন : তাহলে তোমার পরিবারের লোকদেরকেই এগুলো খেতে দাও।[৭]

☞প্ (৪) : অনেককেই বলতে শুনি, আজ সাহারি খেতে পাইনি। তাই রোজা রাখি নাই। আসলে রোজা রাখার জন্য কি সাহারি খাওয়া আবশ্যক? সাহারি না খেয়ে রোজা রাখলে কি রোজা হবে না?

সিদ্দীক লস্কার, রামপাল, বাগেরহাট

উত্তর : সিয়াম রাখার জন্য সাহারি খাওয়া ওয়াজিব নয়। সাহারি খাওয়া সুন্নাত। নবী ﷺ সাহারিকে বরকতময় খাবার

[৪] *সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত :* ১৬
[৫] *সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: ইসলাম ধর্ম সহজ*
[৬] *সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইতেসাম, সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফযীলত*
[৭] *সহীহ বুখারী, হা :* ৯২২

বলে উল্লেখ করেছেন। তাই কোনো কারণবশত সাহারি খেতে না পারলে বিনা সাহারিতে সিয়াম হয়ে যাবে। অর্থাৎ সাহারি খেতে না পারলেও সিয়াম রাখা আবশ্যক। সাহারিতে খেতে পারেনি, এই অযুহাতে রমাযান মাসে দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া করা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

☞ প্রশ্ন (৫) : *টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে রমাযান মাসে সাহারির আযান দিলে আযান হবে কি?*

রহমান, শালিখা, মাগুরা

উত্তর : টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে আযান দেয়া সঠিক নয়। কেননা আযান একটি ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত করা জরুরি।

☞ প্রশ্ন (৬) : *ইফতারের জন্য কি কোনো দু'আ আছে? রোযাদার কি মুআয্যিনের জবাব দিবে নাকি ইফতার খাওয়া চালিয়ে যাবে?*

জুনায়েদ, মুজিবনগর, মেহেরপুর

উত্তর : দু'আ কবূল হওয়ার অন্যতম সময় হচ্ছে ইফতারের সময়। কেননা সময়টি হচ্ছে ইবাদতের শেষ সময়। তাছাড়া মানুষ সাধারণত ইফতারের সময় দুর্বল হয়ে পড়ে। আর মানুষ যখন দুর্বল হয় এবং তার অন্তর যখন বেশি নরম হয় তখন দু'আ করলে আল্লাহর দিকে অন্তর বেশি ধাবিত হয় তাতে ইখলাস থাকে বেশি।

ইফতারের সময় দু'আ হচ্ছে,

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

"হে আল্লাহ আপনার জন্য রোযা রেখেছি এবং আপনার রিযিক দ্বারা ইফতার করছি।"[৮] নবী ﷺ ইফতারের সময় এই দু'আ পাঠ করতেন,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

'তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা তাজা হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিদানও মিলবে।"[৯]

হাদীস দু'টিতে যদিও দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু কোনো কোনো আলেম একে হাসান বলেছেন। মোটকথা আপনি যখন এগুলো পাঠ করবেন অথবা আপনার মনের ইচ্ছা মোতাবেক অন্য কোনো দু'আ পাঠ করবেন, তখন জেনে রাখবেন যে, ইফতারের সময় হচ্ছে দু'আ কবূল হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন, **إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ** "সিয়াম ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"

আর ইফতারের সময় মুআয্যিনের জবাব দেয়া শরীয়ত সম্মত। কেননা নবী ﷺ বলেন, **إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ**-মুআয্যিনের আযান শুনলে তার জবাবে সে যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বলো।"[১০] এ হাদীসটি প্রত্যেক অবস্থাকে শামিল করে। তবে দলীলের ভিত্তিতে কোনো অবস্থা এর ব্যতিক্রম হলে সে কথা ভিন্ন।

☞ প্রশ্ন (৭) : *শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি কী? রমাযানের কাযা সিয়াম আগে রাখবো, না কি শাওয়ালের সিয়াম আগে রাখবো?*

কাউসার আহমাদ, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

উত্তর : শাওয়ালের ছয় রোযা পালন করার ক্ষেত্রে উত্তম হলো, সরাসরি ঈদের পরদিন থেকেই উহা শুরু করা এবং ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। আলেমগণ এভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কেননা এতেই রমাযানের অনুসরণ বাস্তবায়ন হয়। হাদীসে বলা হয়েছে **ثم أتبعه** "যে ব্যক্তি রমাযানের পরপরই শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে"। এটি সৎ কাজ সম্পাদনে প্রতিযোগিতার সাথে এগিয়ে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। শরীয়তে প্রতিযোগিতাসহ সৎকাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তা সম্পাদনকারীর প্রশংসা করা হয়েছে। এছাড়া এটি বান্দার দৃঢ়তার প্রমাণ, বান্দার পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সুতরাং সুযোগ হাতছাড়া করা অনুচিত। কেননা মানুষ জানে না পরবর্তীতে তার কী অবস্থা হবে। অতএব বান্দার উচিত যখনই তার সামনে তার সমস্ত কাজ-কর্মে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হবে, তখনই সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হবে এবং সুযোগ কাজে লাগাবে।

আর কারো যদি রমাযানের সিয়াম বাকী থাকে, তাহলে সে আগে রমাযানের কাযা সিয়াম পালন করবে। তারপর শাওয়ালের সিয়াম রাখবে। তার যিম্মায় ফরয সিয়াম রয়ে গেছে। তাই নিজের যিম্মায় ফরয সিয়াম বাকী রেখে নফল সিয়াম রাখা বৈধ নয়।

[৮] *আবু দাউদ, সিয়াম। তবে কোনো কোনো আলেম এই হাদীসকে যঈফ বলেছেন*

[৯] *আবু দাউদ, অধ্যায় : সিয়াম*

[১০] *সহীহ বুখারী, অধ্যায় : আযান, সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : সালাত*

প্রশ্ন (৮) : রমাযান মাসে উমরা করার ছাওয়াব সম্পর্কে জানতে চাই।

হাদীসুর রহমান, টেকনাফ, কক্সবাজার

উত্তর : রামাযন মাসে উমরা করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। নবী ﷺ বলেন, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ -রমাযান মাসে উমরা করা হজ্বের সমান। [১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ-এর সাথে হজ্ব করার সমান।

প্রশ্ন (৯) : *রমাযানের শেষে ফিতরা আদায় করা সম্পর্কে এবং ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে জানতে চাই।*

মুখলেসুর রহমান, সেনবাগ, নোয়াখালী

উত্তর : রমাযানের শেষে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ﷺ মানুষের ওপর এক 'সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন।[১২] ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব।

সাদাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে দেশের প্রধান খাদ্য থেকে এক 'সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য তথা বর্তমান হিসাবে প্রায় আড়াই কেজির সমান। একদিন একরাত্রির খোরাকের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির ওপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। এক সা' পরিমাণ ফিতরা আদায়ের দলীলের ক্ষেত্রে ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন-কৃতদাস, ছোট-বড় সকলের ওপর এক 'সা' পরিমাণ ফিত্‌রা ফরয করেছেন। ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার আদেশ দিয়েছেন।"[১৩]

প্রশ্ন (১০) : যারা জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সিয়াম ভঙ্গ করে যেমন ভ্যানচালক, রিকশাচালক, দিনমজুর, মাটির কামলা, ইত্যাদি পেশার লোকেরা অপারগতার অযুহাত দেখিয়ে সিয়াম ভঙ্গ করে। এদের হুকুম কী?

আব্দুল হামিদ, পরশুরাম, ফেনী

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত যেসব কারণে সিয়াম ভঙ্গ করার অনুমতি দিয়েছে, তার মধ্যে জীবিকা নির্বাহের কাজে ব্যস্ত থাকার বিষয়টি নেই। এ সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যাতে আমার আদেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"[১৪] অতএব যারা এই অযুহাতে সিয়াম ভেঙেছে, তাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে তাওবা করা এবং সিয়াম শুরু করা। উল্লেখ্য যে, একজন মুমিন-মুসলিমের ওপর আবশ্যক হচ্ছে, রমাযান মাস আসার আগেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ভ্যান চালক, রিকশাচালক, দিনমজুর, মাটির কামলা, ইত্যাদি পেশার লোকগণ যাতে রমাযান মাসে বেশি পরিশ্রম করার কারণে সিয়াম ভাঙতে বাধ্য না হয়, সেই জন্য রমাযানের আগের মাসগুলোতে একটু বেশি প্ররিশ্রম করবে এবং রমাযান মাসের জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি সঞ্চয় করে রাখবে। আল্লাহ সহায়।

প্রশ্ন (১১) : আমলের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলে দুআ কবুল হয় শুনেছি, কিন্তু নিয়মটা জানা নেই। দয়া করে জানাবেন।

আতাউর রহমান, হাইমচর, চাঁদপুর

উত্তর : এখানে তিন ব্যক্তির ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে একটি গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল। ওপর থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে গুহা থেকে তাদের বের হওয়া অসম্ভব হয়ে গেল। অতঃপর তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎ আমল তুলে ধরে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিল। একজন পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার ওসীলা দিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার ওসীলা দিল এবং তৃতীয়জন তার চাকরের বেতন পূর্ণভাবে প্রদান করার ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা আরম্ভ করল। তারা প্রত্যেকেই দু'আয় বলেছিল, হে আল্লাহ! আমি যদি এই আমলটুকু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। এভাবে দু'আ করার পর পাথরটি সরে গেল এবং তারা গুহা থেকে বের হয়ে আসল।

এটাই হচ্ছে সৎ আমলকে ওসীলা ধরে দু'আ করার পদ্ধতি। এতে প্রমাণিত হয় যে, সৎকাজের ওসীলা দিয়ে দুআ করলে তা কবুল হয়।[১৫]

---

[১১] *সহীহ বুখারী, হা : ১৭৮২*
[১২] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[১৩] *সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম*
[১৪] *সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : বিচার ফয়সালা*
[১৫] *সহীহ বুখারী, হা : ২২১৫*

প্রশ্ন (১২) : *অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার হুকুম কী? পর্যটনের উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণের বিধান কী?*

গোলাম আজম, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

উত্তর : তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করা বৈধঃ

১) ভ্রমণকারীর কাছে প্রয়োজনীয় ইল্‌ম বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সকল সন্দেহ থেকে বিরত থাকা সম্ভব।

২) তার কাছে এমন দ্বীনদারী বিদ্যমান থাকা, যার মাধ্যমে সে নফসের প্রবৃত্তি দমনে সক্ষম হবে।

৩) অমুসলিম দেশে ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকা।

উপরের শর্তগুলো পাওয়া না গেলে অমুসলিম দেশে সফর করা বৈধ নয়। কেননা এতে ফিতনার ভয় রয়েছে। এতে প্রচুর সম্পদও বিনষ্ট হয়ে থাকে। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন চিকিৎসার জন্য অথবা শিক্ষা অর্জনের জন্য, যা অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণ করার কোনো দরকার নেই; বরং এমন ইসলামী দেশে যাওয়া যায় যেখানে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা হয়। আমাদের ইসলামী দেশসমূহে আল্লাহর মেহেরবাণীতে যথেষ্ট পর্যটনের স্থান রয়েছে। সেখানে পর্যটনের জন্য যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে ছুটি কাটানো সম্ভব।

প্রশ্ন (১৩) : *বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামী শিক্ষা সঙ্কুচিত করে তার স্থলে ইসলামবিরোধী ও অনৈতিক কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছে। একজন মুসলিম হিসেবে আমার করণীয় কী?*

নূর ইসলাম, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ

উত্তর : সাধ্য অনুযায়ী সকলের ওপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করা জরুরী। নবী ﷺ বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো গর্হিত কাজ দেখে, তবে সে যেন তা স্বীয় হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি তা করতে সক্ষম না হয় তবে যেন জবান দ্বারা বাধা দান করে, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে। আর এটা হল সর্বাধিক দুর্বল ঈমান"।[১৬] শক্তি প্রয়োগ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সময় শক্তি থাকা আবশ্যক। যাতে করে শক্তি প্রয়োগ করার কারণে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। সুতরাং মানুষের উচিৎ সে তার ঘরের লোকদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করবে। তার সন্তানদের ওপর জোর খাটাবে, তার স্ত্রীর ওপর এবং তার অধীনস্তদের ওপর শক্তি প্রয়োগ করবে। এমনিভাবে যেই সংস্থার লোকদেরকে বলপ্রয়োগ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তারা অবশ্যই বলপ্রয়োগ করবে এবং তারা তাদের প্রতি জারিকৃত নির্দেশনা অনুপাতে কাজ করবে। তাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিবাদ করার অনুমোদন দেয়া হয়নি, তারা তা জোর করে পরিবর্তন করতে যাবে না। কেননা যেই অন্যায়কে জোর করে পরিবর্তন করার পারমিশন তাকে দেয়া হয়নি, তা যদি জোর করে পরিবর্তন করতে যায়, তাহলে উক্ত অন্যায়ের চেয়ে আরো বড় অন্যায় ও ক্ষতি দেখা দিবে। সেই সঙ্গে তার মাঝে এবং মানুষের মাঝে বিরাট ধরনের ঝামেলা ও ফিতনা সৃষ্টি হবে। এমনকি তার মাঝে এবং প্রশাসনের মধ্যেও সংঘর্ষ তৈরি হবে। সুতরাং তার ওপর আবশ্যক হলো জবানের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। সে বলবে, হে অমুক! আল্লাহকে ভয় করো, এই কাজ করা জায়েয নয়, এটি তোমার ওপর হারাম, এটি তোমার ওপর ওয়াজিব.....ইত্যাদি। সে জবানের মাধ্যমে শরীয়তের দলীল বর্ণনা করবে। আর শক্তি প্রয়োগ কেবল নিজের ঘরের লোকদের ওপরই করবে অথবা যারা তার অধীনস্ত অথবা শাসকের পক্ষ হতে তাকে যাদের ওপর বল প্রয়োগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, তাদের ওপরই বল প্রয়োগ করবে। যেমন রাষ্ট্রপ্রধান যেই সংস্থার লোকদেরকে বলপ্রয়োগ করে অন্যায় প্রতিহত করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তারা তাদের ওপর ন্যস্ত অধিকারের ভিত্তিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শরীয়তসম্মত পন্থায় অন্যায় প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। তাতে মোটেই কম বা বেশী করবে না। রাজ্যের নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের গভর্নরের ক্ষেত্রেও একই কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হতে প্রদত্ত অধিকার বলে সে তার অধীনস্ত লোকদেরকে অন্যায় কাজ করা থেকে শক্তিপ্রয়োগ করে বিরত রাখবে।

[১৬] *সহীহ মুসলিম, হা : ১৮৬*